বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি ২০২২

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি
ও
শ্রম অর্থনীতি

২০২২

People Change the World Diakonia

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি ২০২২

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনা
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি
৬/৫ এ, স্যার সৈয়দ রোড (২য় তলা)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন : +৮৮ ০২ ৯১১৯৯০৩-৪, মোবাইল: +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০
ই-মেইল : info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট: www.safetyandrights.org

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২৩

স্বত্ব
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

আলোকচিত্র
ইন্টারনেট

দাম
১০০ টাকা

The State of Labour and Labour Economy of Bangladesh 2022

Documentation, Editing and Publication
Safety and Rights Society (SRS)
6/5 A, Sir Syed Road (1st floor)
Mohammadpur, Dhaka 1207
Mobile: +88 01974666890
info@safetyandrights.org
safetyandrights.org
Safety and Rights Society
Safety and Rights Society

Date of Publication
January 2023

Price
100 Tk.

Copyright
Safety and Rights Society (SRS)

ISBN : 978-984-35-3582-5

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	৫
শ্রমবাজার ২০২২: সামনে এলো তিন চ্যালেঞ্জ: অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যস্ফীতি, অটোমেশন	৭
বাজেটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বাড়ছে না	১০
শ্রমবিধির সংশোধন নিয়ে শ্রমিকদের অসন্তোষ	১২
জিনিসপত্রের উচ্চদামে শ্রমিকরা আধমরা	১৫
পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বিতর্ক	১৭
ইজিবাইক বিরোধী প্রচারণা অব্যাহত	১৯
বগুড়ার হালকা প্রকৌশল শিল্পের শ্রমিকরা প্রাতিষ্ঠানিক খাতের মর্যাদা চায়	২১
জ্বালানির দাম বৃদ্ধি সমুদ্রগামী জেলেদের খরচ বাড়িয়েছে	২৩
আন্দোলন করে ৫০ টাকা মজুরি বাড়ালো চা শ্রমিকরা	২৫
চামড়া শিল্প-নগরীতে দূষণ-সংকট কাটলো না	২৭
বিসিক শিল্পনগরীগুলো শ্রমিকবান্ধব হয়ে উঠেনি	৩১
চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বাংলাদেশের সামনে দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ হাজির করছে	৩৩
জলবায়ু দুর্যোগে পেশাচ্যুত বিপুল শ্রমজীবী: পুনর্বাসন চাহিদা বাড়ছে	৩৫
দেশে কম্পানি অনেক, কল্যাণ তহবিলে মুনাফার হিস্যা তিন শতের কম সংস্থার	৩৭
অর্থনৈতিক মন্দার মুখে প্রবাসী শ্রমিকদের আয়ের গুরুত্ব বেড়েছে	৩৯
পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন	৪১
ইন্টারনেটভিত্তিক ঠিকা কাজের মানুষদের নেই কোন সংগঠন	৪৩
সীতাকুণ্ড বিস্ফোরণের শিক্ষা আমরা কাজে লাগিয়েছি তো?	৪৫
Labor Market and Labor Mobility 2022: Three Challenges: Economic Recession, Inflation, Automation	৪৮
Workers lose jobs due to climate induced disaster, demand for rehabilitation increases	৫২
Grimy life of sanitation workers	৫৪

সম্পাদকীয়

সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

সময় বড় অন্ধ এবং বধির। কিন্তু গতিশীল। থামতে জানে না সে। সে কারণেই শ্রমজীবী জীবনের তীব্র বিপন্নতার মাঝেও নতুন বছর এলো। বিগত বছর বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের জীবনধারায় প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দুটি। প্রথমত, প্রায় অধিকাংশ খাতে মজুরি না বাড়া; দ্বিতীয়ত দ্রব্যমূল্যের অবিশ্বাস্য বৃদ্ধি। কোন সমাজে যখন কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর মজুরি বাড়ে না কিন্তু নিত্যদিনের ব্যবহার্য জিনিসের দাম বাড়তে থাকে তখন তাদের অবস্থা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়।

প্রায় ৪ বছর হয়ে গেছে দেশের প্রধান শিল্পখাতে নিম্নতম মজুরি হার নবায়ন করা হয়নি। অথচ এর মাঝে প্রতি বছরই প্রায় ৮-১০ শতাংশ হারে দরকারি পণ্যের দাম বেড়েছে। ফলে গার্মেন্ট খাতে এখন শ্রমিক জীবনে টানাপোড়েন চরম আকার নিয়েছে। অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের অবস্থাও বিশেষ ব্যতিক্রম নয়। বহুল আলোচিত 'দুর্ভিক্ষ' না এলেও সীমিত পরিসরে শ্রমজীবী পরিবারগুলো নিজেরাই খাদ্যদ্রব্য কম কিনতে বাধ্য হয়েছে এ বছর।

এর মানে অবশ্য মোটেই এমন নয় যে, দেশের সবাই ২০২২ সালে খারাপ ছিল। আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি, এবছরও তুমুল বেগে ব্যাংকগুলোতে কোটিপতি আমানতধারীর সংখ্যা বেড়েছে। দৈনিক যুগান্তর (৮ সেপ্টেম্বর ২০২২) লিখেছে, ২০২১ সালের জুনে কোটি টাকা বা তার বেশি অর্থের আমানতধারীর সংখ্যা ছিল ৯৯ হাজার ৯১৮টি। ২০২২ সালের জুনে সেটা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৮ হাজার ৪৫৭টি। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে কোটিপতি আমানতধারীর সংখ্যা বেড়েছে আট হাজারেরও অধিক। এটা নিশ্চয়ই ভালো যে, দেশে অনেকের আয় বেড়েছে। কিন্তু সমাজে একই সময় কোটি কোটি মানুষ খাওয়া-পরার ন্যূনতম ব্যবস্থা করতে হিমশিম খাচ্ছে। মহামারিতে দারিদ্র্যও বেড়েছে। এই ভারসাম্যহীনতা রাষ্ট্র ও সরকারের জন্য কোন ভালো খবর নয়।

গত ৫০ বছর ধরে এ দেশের সকল সরকার দারিদ্র্য অবস্থা লাগবে সচেষ্ট। কিছু উন্নতিও হয়েছে এক্ষেত্রে। কিন্তু ২০২২-এ এসে দেখাচ্ছে সমাজে চরম ধনবৈষম্য বেড়ে গেছে। একদিকে হু হু করে কোটিপতি তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমজীবীদের পাড়াগুলোতে ন্যায্যমূল্যে চাল-ডাল কেনার জন্য নারী-পুরুষের সারি দীর্ঘ হচ্ছে। এ অবস্থা কাম্য নয়। এটা সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট করবে। এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকারও ছিল না। সুতরাং সকল উপায়ে এই বৈষম্য কমাতে উদ্যোগী হওয়া দরকার।

গত পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখলাম কৃষি ও শিল্প যেভাবে চলছে তাতে মুষ্টিমেয় এক দল মানুষের হাতে দেশের সম্পদ স্থানান্তর হয়ে যাচ্ছে। অন্য কোটি কোটি মানুষ ভবিষ্যতহীন শ্রমিক জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। নিজেদের সন্তানকে তারা কম মজুরি আর দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের করে আনতে পারছে না কোনভাবে। এতে করে সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি প্রত্যাশিত মাত্রায় সফল হচ্ছে না।

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি মনে করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে আমাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যমুক্ত একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে পুরো দেশজুড়ে যেসব প্রচেষ্টা চলছে আমরা তার শরিক। আমাদের প্রধান লক্ষ্য শ্রমজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যথাসাধ্য অবদান রাখা। তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন। সেজন্য যেসব কাজ করছি আমরা– তারই অংশ হিসেবে প্রতিবছর এই সংকলন প্রকাশিত হয়। এখানে আমরা মূলত শ্রম খাতের বিগত বছরের সংক্ষিপ্ত একটা চিত্র তুলে ধরে থাকি। এ কাজে আমরা দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর তথ্য সহায়তা নিয়ে থাকে। ফলে আমাদের এই সংকলনকে পুরোপুরি জাতীয় সংবাদ মাধ্যমভিত্তিক বলা যায়। আমাদের প্রচেষ্টার বিষয়ে পাঠকদের যেকোন অভিমত সাদরে গৃহীত হবে। আগামীতে আমরা বাৎসরিক এই সংকলন প্রক্রিয়া আরো এগিয়ে নিতে ইচ্ছুক।

সবাইকে ধন্যবাদ।

সেকেন্দার আলী মিনা

শ্রমবাজার ২০২২: সামনে এলো তিন চ্যালেঞ্জ

অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যস্ফীতি, অটোমেশন

২০২২-এ শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত না হলেও বিগত বছরের ন্যায় কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শ্রমমান উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। যার ধারাবাহিকতায় শ্রমবিধি-২০১৫ সংশোধন এবং শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান ছিল। এছাড়া শ্রম সংক্রান্ত বিরোধ ও সহিংসতাও নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবে বছর জুড়ে নেতিবাচক প্রবনতারও কমতি ছিল না। যাকে অনেক বিশেষজ্ঞ বলছিলেন 'স্ট্যাগফ্লেশন'। অর্থাৎ দেশে মুদ্রাস্ফীতি, জিনিসপত্রের দাম বাড়া এবং উচ্চ বেকারত্ব একসঙ্গে শুরু হয়েছে। সঙ্গে যুক্ত আছে শ্রমিকজীবনে প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়া এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখীতা।

অর্থনৈতিক মন্দায় বিনিয়োগ কমে যাওয়া এবং দ্রব্যমূল্য বাড়ার ফলে মানুষের ভোগে সংকোচন কর্মসংস্থানের হারকে নিম্নমুখী করে রেখেছিল গত বছর। কম ভোগ কম উৎপাদনে বাধ্য করছে পণ্য উৎপাদকদের। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় কোন খাতে শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি– বরং 'প্রকৃত মজুরি' কমে যাচ্ছিলো। বিশ্বজুড়েও ছিল একই অবস্থা। ফলে বাংলাদেশ থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানও আশানুরূপ ঘটেনি।

মহামারি কমে আসার পর জাতীয়ভাবে যখন অর্থনীতি আবার ঘুরে দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছিলো তখনি শুরু হলো ইউক্রেনযুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা। সরকারও এসময় ঘোষণা দিয়ে ব্যয় সংকোচন নীতি নেয়। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রকল্পে বরাদ্দ বন্ধ বা কমিয়ে দেয়া হয়। রিজার্ভ সংকটের কারণে সরকার বড় ধরনের নতুন প্রকল্পে হাত দিতে অনিচ্ছুক ছিল বছরের শেষার্ধে। এসবও অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানের প্রবাহ কমিয়েছে।

বছরের মাঝামাঝি ১২ আগস্ট আইএলও তাদের এক প্রতিবেদনে জানায়, এই মুহূর্তে বাংলাদেশি তরুণদের বেকারত্বের হার ১০ দশমিক ৬ শতাংশ, যদিও জাতীয় পর্যায়ের বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ২ শতাংশ। ১৮ জানুয়ারি আইএলও'র আরেকটি প্রতিবেদন উদ্বৃত করে ঢাকা ট্রিবিউন লিখেছে: বাংলাদেশে প্রায় ৩৬ লাখ মানুষ ২০২২ সালে বেকার থাকবে। যা মহামারি-পূর্ব সময়ের তুলনায় অন্তত ৫ লাখ বেশি। স্বভাবত কয়েক মাস পর শুরু হওয়া অর্থনৈতিক মন্দার ফলে আইএলও'র এই অনুমানের চেয়েও বেকারত্ব বেড়েছে। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জরিপে বেকারত্বের হার আইএলও'র চেয়ে অনেক বেশি দেখা গিয়েছে বিভিন্ন সময়। উল্লেখ্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনের বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশে কিশোর-তরুণদের সংখ্যা শিশু ও বৃদ্ধদের তুলনায় অনেক বেশি। এসময় তরুণদের উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত করতে না পারা গেলে সেটা দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি করতে পারে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকে বলছেন।

পোশাক খাতে বৈশ্বিক মন্দার ছায়া

বাংলাদেশে শহুরে কর্মসংস্থানের বড় খাত পোশাক শিল্পে ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনৈতিক নাজুকতার চাপ থাকায় সেখানেও শ্রমিক সংখ্যা বাড়ার সুযোগ ছিল না এ বছর। যদিও এ বছর পুরানো ক্রয়-আদেশের পন্য রফতানির সূত্রে কাজ ছিল– কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোর জন্য ক্রয়াদেশ কমছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে (২৯ আগস্ট ২০২২)। যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্ট আগস্টে সারা বিশ্বের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া শত শত কোটি ডলার মূল্যের পণ্য কেনার আদেশ বাতিল করে। এতে দুশ্চিন্তায় পড়েছে বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায়ী। কারণ, বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের শীর্ষ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি ওয়ালমার্ট।

দেশে গণকর্মসংস্থানের আরেক বড় এলাকা নির্মাণ খাতেও টানাপোড়েন চলছিল রড সিমেন্টের দাম বাড়ার কারণে। ১২ মাসের ব্যবধানে সিমেন্টের দাম বেড়েছে বস্তাপিছু প্রায় একশ টাকা। বাংলাদেশ অটো রি-রোলিং অ্যান্ড স্টিল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানোয়ার হোসেন ১৭ মার্চ টিবিএসকে বলেন, রডের মূল কাঁচামাল স্ক্র্যাপ লোহা আমদানির খরচ টনপ্রতি আগে ছিল ৪৩৫ ডলার। রাশিয়া-

ইউক্রেনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেটা এখন প্রায় ৫০০ ডলারে ঠেকেছে। মানোয়ার হোসেন বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে এসব নির্মাণ সামগ্রীর দাম আরও বাড়তে পারে। উপরোক্ত প্রবণতার মাঝে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে নির্মাণ খাত এতদিন যেভাবে বিপুল কর্মজীবীকে কাজের সুযোগ করে দিয়েছিল বছর শেষে সেটা আর পারছিল না। অথচ প্রতি বছর লাখ লাখ তরুণ-তরুণী নতুন করে শ্রম বাজারে যুক্ত হয় এদেশে। ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম দিল ২০২২-এ।

বেকারত্ব বাড়ার কারণে শ্রমজীবী পরিবারগুলোতে কাজ আছে এমন ব্যক্তিদের উপর পরিবারের অন্যদের নির্ভরতাও বেড়েছে। যা সামগ্রিকভাবে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করেছে। এ বছর বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের কথাও ব্যাপকভাবে আলোচনায় ছিল। উল্লেখ্য, মূল্যস্ফীতি বছরের বিভিন্ন সময় সরকারি হিসাবেই দুই অংকের ঘর ছুঁয়ে যাচ্ছিলো। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর ২০২২-এর মার্চ মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী শহর এলাকায় সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৪৭ শতাংশ। আর গ্রামে এই হার ১২ দশমিক ১০ শতাংশ। আগস্ট ২০২২ সালে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে এই হার যে আরও আকাশচুম্বী হয়েছে সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। সামগ্রিক 'স্ট্যাগফ্লেশন'-এর সেই ছবিই শহরগুলোর আনাচে কানাচে ধরা পড়ছিল টিসিবি বা অন্য কোন সংস্থার ন্যায্যমূলের 'ট্রাকসেল'-এর দীর্ঘ লাইনে এবং সকালের ভাসমান 'শ্রমিক বাজার'গুলোতে। কম দামে চাল-ডাল বিক্রির সীমিত উদ্যোগ ছাড়া শ্রমজীবীদের জন্য নির্দিষ্টভাবে আর কোন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছিল না। যদিও বাজেটকালে শ্রমিক সংগঠনগুলোর সেরকম প্রবল দাবি ছিল। মন্দা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের দুর্দশাও অনেক বাড়িয়েছে। বিগত বছরগুলোতে শ্রম অর্থনীতির প্রায় ৮০ ভাগ ছিল এরা এবং সেই ধারা ২০২২-এও অব্যাহত ছিল। এ বছর শ্রমবিধিতে যেসব সংশোধনী এসেছে তাতেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য কিছু ছিল না। বরং নতুন সংশোধনীতে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের মাতৃত্বকালীন সুবিধা কমার শংকা আছে।

অটোমেশনে গতি

অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির পাশাপাশি অটোমেশনও শ্রমখাতকে নানানভাবে প্রভাবিত করেছে বছরজুড়ে। গ্রামে কৃষি জমি তৈরির কাজ, ধান রোপন ও মাড়াইয়ের কাজে নানান ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার বাড়তে থাকায় সেখানে খেতমজুরদের প্রয়োজন আগের চেয়ে কমে গেছে। আবার পোশাকখাতেও যন্ত্রনির্ভর উৎপাদনের যুগ শুরু হওয়ায় নারী শ্রমিকদের বদলে পুরুষ শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ছে ইদানিং। বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ১০ এপ্রিল 'আজ সারাবেলা' নামের একটা নিউজ পোর্টালকে বলেছেন, কারখানাগুলোতে আগে দুজন অপারেটরের বিপরীতে কমপক্ষে একজন সহযোগী বা হেলপার থাকতেন। কিন্তু বড় কারখানাগুলোতে এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি চলে এসেছে। ফলে সহযোগী পদের প্রয়োজনীয়তা ফুরাচ্ছে।

কৃষি ও শিল্পে অটোমেশনের উপরের দুই বাস্তবতায় কাজ হারানোদের পুনর্বাসনে জাতীয়ভাবে ব্যাপকভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উদীয়মান প্রবণতা হিসেবে সামনে আসছে। জাতীয় গবেষণা সংস্থা বিআইডিএসের সাত হাজার শ্রমিকের মাঝে পরিচালিত এক জরিপ উদ্বৃত করে ৩ সেপ্টেম্বর দৈনিক টিবিএস জানিয়েছে, দেশের শ্রম খাতে চার শতাংশেরও কম শ্রমিক প্রশিক্ষণ সুবিধা পায় এবং সামগ্রিকভাবে দেশের প্রধান প্রধান খাতে চাহিদার সঙ্গে শ্রম দক্ষতার ব্যবধান প্রায় ৩০ ভাগ। পোশাক ও বস্ত্রখাতে বছরে শ্রমিক প্রশিক্ষণের হার এক শতাংশেরও নীচে। খুব কম শিল্প প্রতিষ্ঠানই তাদের শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করে থাকে। আবার শ্রম দক্ষতার নিম্নমান বিদেশী বিনিয়োগ কম আকর্ষণ করে। এসব মিলেই কম দক্ষতা, কম বিনিয়োগ, কম উৎপাদনশীলতা, কম মজুরির এক দুষ্টচক্রে পড়ে গেছে বাংলাদেশের শ্রমজীবীরা। বিআইডিএসের উপরোক্ত জরিপে দেখা গেছে প্রবাসে যাওয়া শ্রমিকদের মাঝে প্রায় ৪৭ শতাংশ কোন বিশেষ কাজের দক্ষতা ছাড়াই বিদেশ যাচ্ছে। কয়েক দশক আগেও অদক্ষ শ্রমিকের হিস্যা অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় প্রচেষ্টা আশানুরূপ আগায়নি। আগের অবস্থানেই আছে বাংলাদেশ। এসবই ঘটেছে গত এক দশক 'উচ্চ প্রবৃদ্ধি'র দীর্ঘ প্রচারণার পরপর। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কোন দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ নেয় নি। দেশের শিক্ষা কাঠামোকে কর্মজগতের উদীয়মান

চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় করে ঢেলে সাজানোর কাজটিও যে হয়নি সেটা বোঝা যায় উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের প্রতি শিল্প-অর্থনীতির অনাগ্রহ দেখে। একইভাবে উচ্চপ্রবৃদ্ধি গ্রামীণ অর্থনীতির গতিশীলতায়ও বড় কোন ভূমিকা রাখেনি। যার পার্শ্বফল হিসেবে দেখা যাচ্ছে শ্রমিক হিসেবে প্রবাসে যাওয়া বা ভাগ্যান্বষণে শহরমুখী হওয়ার চেষ্টা ছাড়া গ্রামের তরুণদের সামনে আর করার মতো তেমন কিছু নেই। এই অবস্থাকে অসহনীয় করছে জলবায়ু পরিবর্তন। ২০২২-এও আবহাওয়ার মওসুমী চরিত্র নাটকীয়ভাবে পাল্টে যেতে দেখা গেছে। দীর্ঘ বর্ষা এবং শীতের শুরুতে বৃষ্টি কৃষিখাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করায় সেখানে লোকসানের খবরাখবর বেড়েছে।

শহুরে শ্রমখাতে শোভন কর্মপরিবেশের ঘাটতি নিয়ে পূর্বের বছরগুলোতে যে উদ্বেগ ছিল সেটা এবছরও অব্যাহত ছিল। চট্টগ্রামের সিতাকুণ্ড দুর্ঘটনায় বিপুল সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক কর্মীর মৃত্যু শিল্পদুর্ঘটনা রোধে আরও বেশি জাতীয় সতর্কতার তাগিদ তৈরি করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক–অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতে শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশের দাবিটি সিতাকুন্ড দুর্ঘটনার পর নতুন করে প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। তবে এ বছর চা খাতে শ্রমিকরা আন্দোলনের মাধ্যমে দৈনিক ৫০ টাকা মজুরি বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। তাদের আন্দোলনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মধ্যবিত্ত সমাজের সামাজিক সংহতিও দেখা গেছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়।

এত কিছুর পরেও, আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুসরণে বাংলাদেশ তার অবস্থান আরো দৃঢ় করেছে ন্যূনতম বয়স সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন নং ১৩৮ অনুসমর্থনের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, এ কনভেনশনের সাথে সাজুয্যপূর্ণ কনভেনশন নং ১৮২ (অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন) বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে অনেক আগেই এবং প্রথম দিকের অনুসমর্থনকারী দেশের মধ্যে একটি বাংলাদেশ। একই সাথে কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসন সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থনেরও জোরালো দাবী উঠেছে শ্রমিক ও নাগরিক সংগঠনের পক্ষ থেকে।

শ্রমিকদের জন্য এসআরএস'র কিছু সক্রিয়তা

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শ্রমমান উন্নয়নের প্রচেষ্টায় এসআরএস নির্মাণ, গার্মেন্টস, পাথরভাঙ্গা, ও ট্যানারিসহ অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকদের বিভিন্নভাবে সচেতন করছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জেন্ডার, পরিবেশ ও শ্রম আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভাসহ বিভিন্ন ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করেছে। এসআরএস কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিক এর পরিবারকে শ্রম আইন মতে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিনামূল্যে আইনী সহায়তার মাধ্যমে মোট ১০,০০,০০০ (দশ লাখ টাকা) এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে মোট ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার টাকা) আর্থিক সহায়তা পেতে সহযোগিতা করেছে। জাতীয় বাজেট স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং সর্ব শ্রেণীর জনগণকে বাজেট সচেতন করতে জন বাজেট সম্মেলনসহ বিভিন্ন সভা, ক্যাম্পেইন ও সমন্বয় সভার আয়োজন করেছে। প্রায় ১০০ জন শ্রমিককে মনোসামাজিক যত্ন এবং আইনী পরামর্শের জন্য কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যস্ফীতি, অটোমেশন এর কারণে শ্রমিকদের কঠিন সময় পার করতে হচ্ছে। তাদের জীবনমান উন্নয়নে এসআরএস সর্বদা পাশে থেকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে।

বছরজুড়ে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত ৭১২ জন শ্রমিক

২০২২-এ সারাদেশে ৫৪৭টি কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৭১২ জন (সীতাকুন্ড দুর্ঘটনায় নিহত ৫০ জনসহ) শ্রমিক নিহত হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত (১৫টি জাতীয় এবং ১১টি স্থানীয়) খবরের ওপর ভিত্তি করে সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) এই জরিপ পরিচালনা করেছে। যেসকল শ্রমিক কর্মক্ষেত্রের বাহিরে অথবা কর্মক্ষেত্র থেকে আসা-যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় অথবা অন্য কোন কারণে মারা গিয়েছেন তাদের এই জরিপে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।

জরিপে প্রাপ্ত কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিহত হয়েছে পরিবহন খাতে- যাদের সংখ্যা মোট ৩৩৩ জন। এর পরেই রয়েছে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে (যেমন- ওয়ার্কশপ, গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) ১৭০ জন, নির্মাণ খাতে নিহত হয়েছে ১০৪ জন, কৃষি খাতে ৬২ জন এবং কল-কারখানা ও অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে এই সংখ্যা ৪৩ জন।

মৃত্যুর কারণ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৫৩ জন; বিভিন্ন বিস্ফোরণে ৮৪ জন; বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৬৯ জন; বজ্রপাতে ৫৭ জন; মাঁচা বা উপর থেকে পড়ে ৪৫ জন; শক্ত বা ভারী কোন বস্তুর দ্বারা আঘাত বা তার নিচে চাপা পড়ে ৩৮ জন; পানিতে ডুবে ২৪ জন; আগুনে পুড়ে ১৪ জন; রাসায়নিক দ্রব্য বা সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পানির ট্যাঙ্কের বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ১৪ জন; পাহাড় বা মাটি, ব্রিজ, ভবন বা ছাদ, দেয়াল ধসে ১৩ জন এবং অন্যান্য কারণে ১ জন শ্রমিক নিহত হয়।

বাজেটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বাড়ছে না

২০২১-২২ অর্থ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৩৬৫ কোটি টাকা। পরে সংশোধিত বাজেটে সেটা হয় ৩৬০ কোটি টাকা। পরের বছর, অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে তাদের বরাদ্দ দাঁড়ায় ৩৫৭ কোটিতে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাজেট যখন এভাবে অর্থ বরাদ্দ কমছিল তখন জাতীয় বাজেটের আকার কিন্তু বাড়ছিল। ২০২১-২২ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা। আর ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এই বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হলো বাংলাদেশের সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সবচেয়ে কম বরাদ্দ পাওয়া মন্ত্রণালয়গুলোর একটি এবং এরকম মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে তালিকায় সবচেয়ে নিচে থাকা দপ্তর।

সর্বশেষ বাজেটে সবচেয়ে কম বরাদ্দ পাওয়া মন্ত্রণালয়গুলোর ৫টি হলো: বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (৫৪৫), সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় (৬৩৭), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (৯৯০), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (১৩৩৮) এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (৩৫৭)।

উল্লেখ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাজেট যে কেবল দেশের বাকি সব মন্ত্রণালয়ের চেয়ে কম তাই নয়– সেটা তেমন বাড়ছেও না; এমনকি কোন কোন বছর কমে যাওয়ার লক্ষণই দেখা যাচ্ছে! যেমন, এই মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৫০ কোটি টাকা। পরের বছর ৩৬৫ কোটি টাকা এবং সর্বশেষ সেটা হলো ৩৫৭ কোটি টাকা। অথচ গত তিনটি অর্থবছর মিলে সমগ্র বাজেটের আয়তন বেড়েছে অনেক।

প্রসঙ্গক্রমে এও বলা দরকার যে, শ্রম মন্ত্রণালয় প্রতিবছর যে বাজেট বরাদ্দ পায় তার অর্ধেকই থাকে পরিচালন ব্যয়। যেমন, ২০২১-২২ অর্থ বছরে মূল বরাদ্দ ৩৬৫ কোটি টাকার বিপরীতে পরিচালন ব্যয় ছিল ১৮০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ১৮৫ কোটি টাকা। এই হিসাবে বলা যায় যে, দেশের ছয় কোটির অধিক শ্রমজীবীর অবস্থা 'উন্নয়ন'-এর জন্য সর্বশেষ বাজেটে আনুমানিক বরাদ্দ (৩৫৭ কোটির অর্ধেক হিসেবে) ১৮০ কোটি টাকার কমই হবে। এসব উন্নয়ন ব্যয়েরও বড় অংশ সচরাচর খরচ হয় 'নির্মাণ' কাজে। যেমন, ২০২১-এর উন্নয়ন বাজেটে একটা বড় প্রকল্প ছিল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন।

সর্বজনীন পেনশনের ধারণা বাস্তবায়নে বিলম্ব

২০২২-এর বাজেটকালে শ্রমজীবীদের তরফ থেকে ন্যূনতম যেসব প্রত্যাশার কথা তুলে ধরা হয়– তার মধ্যে ছিল: বিভিন্ন খাতে মজুরি বাড়ানো এবং মূল্যস্ফীতি কমানোর উদ্যোগ নেয়া, শ্রমিকদের নামে রেশন কার্ড দেয়া এবং ভর্তুকিমূল্যে তাদের জন্য নিত্যপণ্য সরবরাহ। এছাড়া সর্বজনীন পেনশন এবং শ্রমিকদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের দাবিও ছিল অনেক সংগঠনের। এর মাঝে সর্বজনীন পেনশনের বিষয়টি ছাড়া কার্যত অন্য কিছুতে তেমন অগ্রগতি হয়নি। বাজেটের পর প্রাতিষ্ঠানিক বড় খাতগুলোর মধ্যে কেবল চা শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে ৫০ টাকা করে। কিন্তু পোশাক শ্রমিকদের মাসে ন্যূনতম ২০ হাজার টাকা মজুরি বৃদ্ধির প্রশ্নে কোন মতামত ছিল না। বছর শেষে সেটা বাড়েওনি।

অন্যদিকে, বাজেটের সময় থেকে মূল্যস্ফীতি এত বাড়ছে যে, ২০২২-এর শেষে সেটা প্রায় দুই ডিজিট মাত্রায় পৌঁছেছে। বাজেটের সময় সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) ও গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন একটা জনমত পরিচালনা করেছিল। তাতে সেসময় ৮৫ ভাগ উত্তরদাতা বলেছিলেন, দ্রব্যমূল কমার কোন নির্দেশনা তাঁরা বাজেটে পাননি। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে মানুষের সেই অভিমতের যথার্থতাই মিলেছে কেবল।

বাজেটে শ্রমিকমুখী কিছু কিছু পদক্ষেপ ছিল অস্পষ্ট। যেমন, রফতানিমুখী পোশাক ও ফুটঅয়্যার খাতের কর্মহীন ৫০

হাজার শ্রমিকের জন্য ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও সেটা কীভাবে খরচ হবে বা হলো তার বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। ঠিক একই রকমভাবে 'কর্মসংস্থান অধিদপ্তর' বলে একটা নতুন অধিদপ্তর চালুর কথা বলা হলেও সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। এদেশে শ্রমজীবীদের ৮৫ ভাগই যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের– তাদের সামাজিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং মজুরির বিষয় নিয়ে বাজেট নীরবই ছিল। অন্যদিকে, বাজেটে সরকার নিজেই বলেছিল, 'সর্বজনীন পেনশন সময়ের দাবি।' কিন্তু এ বিষয়ে 'আইন তৈরির নীতিগত সিদ্ধান্তে'র পরও বাস্তব কাজ কতটুকু এগোলো বা আদৌ এগোলো কি না সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। আইনটি অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। এ বিষয়ে সরকারের ধীরে চলো নীতি জানিয়ে দিচ্ছে সর্বজনীন পেনশনের বিষয়ে কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা পেতে শ্রমজীবীদের বহুকাল লেগে যাবে। এছাড়া শ্রমজীবীরা বরাবরই বলছে, সর্বজনীন পেনশনের সুবিধা পেতে হলে এই তহবিলে রাষ্ট্রের কন্ট্রিবিউশন লাগবে এবং আইন তৈরির সময়ই সেটা উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে

সর্বশেষ বাজেটে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাজেট ছিল ৯৯০ কোটি টাকা। এটা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে বড় অংকে বেড়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এই মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৭০২ কোটি টাকা এবং তারও আগের বছর সেটা ছিল ৬৪২ কোটি টাকা। সামগ্রিক ধারাবাহিকতায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়। তবে অভিবাসনে পিছিয়ে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে দেশজুড়ে কারিগরী প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ার যে ঘোষণা অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় দিয়েছিলেন তার উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন এবং সম্পূর্ণতা দেখা যায় না। এছাড়া প্রবাসী শ্রমজীবীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে কাঠামোগত যেসব উদ্যোগ নেয়ার দাবি ছিল সে বিষয়েও বাজেট নিশ্চুপ ছিল।

উল্লেখ্য, জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে প্রবাসে বা দেশে কাজ করা শ্রমজীবীদের সাংগঠনিকভাবে মতামত রাখার কাঠামোগত সুযোগ বর্তমানে নেই বললেই চলে। ফলে এসব মানুষের বাস্তব প্রকৃত প্রয়োজন বাজেটে প্রত্যাশিত মাত্রায় প্রতিফলিত হচ্ছে না বলে মনে করেন শ্রমিকরা। সংসদে যখন বাজেট উত্থাপিত হয়ে যায় তখনি কেবল শ্রমজীবীরা তাদের জন্য বরাদ্দ সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু তখন সংসদ সদস্য ছাড়া অন্যদের মতামতের আলোকে বাজেটের বড় ধরনের কোন সংশোধন ঘটার নজির নেই।

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

শ্রমবিধির সংশোধন নিয়ে শ্রমিকদের অসন্তোষ

শ্রম আইনের ক্ষেত্রে ২০২২ সালের বড় ঘটনা ছিল ২০১৫ সালের শ্রমবিধির সংশোধন। সেপ্টেম্বরে এ বিষয়ে সরকার গেজেট প্রকাশ করে। এই সংশোধনী ইতোমধ্যে বিস্তর বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে। প্রায় ১০১টি সংশোধন ও সংযোজন-বিয়োজন আছে এতে।

২০০৬ সালে বর্তমান শ্রম আইন তৈরি হয়েছিল। তার বাস্তবায়ন বিধিমালা তৈরি হতে ৯ বছর সময় লাগে। এর মাঝে ২০১৩ সালে সরকার শ্রম আইন এক দফা সংশোধন করে। ২০১৮ সালে এর আরেক দফা সংশোধন হয়। এরপর শ্রমবিধি সংশোধনেরও দাবি ওঠে। উপরোক্ত পটভূমিতে ২০২২ সালের সর্বশেষ সংশোধিত বিধির গেজেট হলো। এই শ্রমবিধি তৈরির ('যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণ') কাজ শুরু হয় ২০১৯ সালে।

যেভাবে শ্রম আইন হয়েছিল

ব্রিটিশ শাসকদের করা ১৮৮১ সালের ভারতীয় কারখানা আইন, যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও গঠিত হবার পর ১৯৩৪ সালে সংশোধিত হয় সেটাই মূলত এদেশের শ্রম ও শিল্প আইনের মূল ভিত্তি। এ আইনটি পাকিস্তান আমলে ১৯৬৫ সালের কারখানা আইন দ্বারা রহিত হয়। এছাড়াও ১৯২৩ সালের ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইন, ১৯২৯ সালের শ্রম বিরোধ আইন, ১৯৩৬ সালের মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৯ সালের মাতৃত্ব সুবিধা আইন, ১৯৩৮ সালের শিশু নিয়োগ আইনসমূহ ব্রিটিশ শাসকদের করা। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তানে এসব আইনের অধিকাংশ পরিমার্জন ও সংশোধন করে বহাল রাখা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশেও ১৯৭২ সালের শুরুতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এডাপটেশন অব বাংলাদেশ ল'জ অর্ডার জারির মাধ্যমে এসব আইনের অধিকাংশ বহাল রাখা হয়। ব্রিটিশ, পাকিস্তানি ও বাংলাদেশ আমলের ২৫টি আইন রহিত করে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে জাতীয় সংসদে কাউকে আলোচনার সুযোগ না দিয়েই মাত্র দুই মিনিটে এই আইনটি পাস হয়।

শ্রমবিধির নতুন সংশোধন নিয়ে আপত্তি

নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন সুবিধা হিসাব করার নতুন নিয়ম যুক্ত করা হয়েছে এবারের সংশোধণে। এতে নারী শ্রমিকেরা আগের চেয়ে সুবিধা কম পাবেন। সাধারণত সরকারি নারী কর্মচারীরা ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি পান (বেতনসহ)। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা আছে। বেসরকারি শিল্প খাতের নারী শ্রমিকেরা সন্তান জন্মের আগে ও পরে আট সপ্তাহ করে ১৬ সপ্তাহ বা চার মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি পান। একই সঙ্গে মাতৃত্বকালীন সুবিধার বিষয়টি কীভাবে নির্ধারণ করতে হবে, তাও বলা রয়েছে। ছুটিতে যাওয়ার আগের তিন মাসের মোট মজুরিকে মোট কর্মদিবস দিয়ে ভাগ করে যে গড় মজুরি বের হবে, সেই হারে চার মাসের মাতৃত্বকালীন সুবিধা পাবেন নারীরা। সংশোধিত শ্রম বিধিমালায় মাতৃত্বকালীন সুবিধা হিসাব করতে নতুন উপবিধি যুক্ত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ছুটির আগের মাসের প্রাপ্ত মোট মজুরিকে ২৬ (সাপ্তাহিক ছুটি বাদ দিয়ে এক মাস) দিয়ে ভাগ করে এক দিনের গড় মজুরির হিসাবে মাতৃত্বকালীন সুবিধা দিতে হবে। নতুন এই নিয়মের কারণে নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন সুবিধা কমবে।

এ ছাড়া নতুন বিধি অনুযায়ী রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকেরা চাকরির বয়স ৯ মাস না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণ তহবিল থেকে সুবিধা পাবেন না। এতদিন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার কারণে নতুন-পুরোনো সব শ্রমিকই তহবিল থেকে সুবিধা পেতেন। কিন্তু নতুন বিধির বলে চাকরিতে যোগদানের ৯ মাসের আগে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হলে বা কেউ অসুস্থ হলে তাঁর আর্থিক সুবিধা পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে গেল।

উল্লেখ্য, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গোষ্ঠী বিমা বাধ্যতামূলক নয়। তার বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রীয় এক কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। সেই তহবিলের সুবিধাভোগীদের জন্য কল্যাণ ও আপত্কালীন নামে দুটি হিসাব রয়েছে। সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব থেকেই কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সুবিধা এবং অসুস্থ শ্রমিকদের সহায়তা দেওয়া হয়। আর তহবিলের

জন্য পোশাক রপ্তানির প্রতিটি কার্যাদেশের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট অর্থের দশমিক ০৩ শতাংশ অর্থ কারখানা মালিকেরা জমা দেন।

সংশোধিত শ্রম বিধিমালায় যৌন হয়রানির বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে। বলে দেয়া আছে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একজন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে গণ্য করা হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ৫ সদস্যের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে অভিযোগ কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে, যার প্রধান হবেন একজন নারী। এ ছাড়া কমিটিতে বেশির ভাগ সদস্য হবেন নারী। তাঁরা সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মী।

এসব সংশোধনীর বিষয়ে সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের তরফ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর এক আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়– এতে করে কোন কোন নারী শ্রমিক প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা আগের চেয়ে প্রায় ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ কম টাকা পাবেন।

সলিডারিটি সেন্টার নতুন শ্রমবিধির মজুরি সংক্রান্ত ধারার বিষয়ে যে বক্তব্য এবং ব্যাখ্যা দিয়েছে তা নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৪৮(১) (২)	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এ নতুন সংযোজিত বিধি ৩৯ক
৪৮। প্রসূতিকল্যাণ সুবিধার পরিমাণ: (১) এই অধ্যায়ের অধীন যে প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা প্রদেয় হইবে উহা উপধারা (২) এ উল্লিখিত পন্থায় গণনা করিয়া দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, গড় মজুরী হারে সম্পূর্ণ নগদে প্রদান করিতে হইবে। (২) উপ-ধারা (১)-এর প্রয়োজনে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক গড় মজুরী গণনার জন্য সংশ্লিষ্ট মহিলাকর্তৃক এই অধ্যায়ের অধীন নোটিশ প্রদানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন মাসে তাহার প্রাপ্ত মোট মজুরীকে উক্ত সময়ে তাহার মোট প্রকৃত কাজের দিনগুলি দ্বারা ভাগ করিতে হইবে।	**৩৯ক। প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা হিসাব:** (১) ধারা ৪৮(২) অনুযায়ী প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা হিসাব করিবার ক্ষেত্রে শ্রমিকের সর্বশেষ মাসিক প্রাপ্ত মোট মজুরিকে ২৬ দ্বারা ভাগ করিয়া ১ (এক) দিনের গড় মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক একজন মহিলা শ্রমিকের সাকুল্য মজুরী ১০ হাজার টাকা; এরূপ অবস্থায় আইনের ও বিধিমালা মোতাবেক তার প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা হবে নিম্নরূপ:

শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৪৮(২)	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ৩৯(ক)
রহিমা প্রসূতিকল্যাণ সুবিধার ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে তিন মাসে, ধরা যাক ২০২২ সালের এপ্রিল, মে ও জুন– এই মাসে মোট মজুরী গ্রহণ করেছেন ১০ হাজার × ৩ = ৩০ হাজার টাকা। ঐ তিন মাসে তার মোট উপস্থিতির দিন ছিল (৯০ দিন-১৩দিন সাপ্তাহিক ছুটি - ৪ দিন সবেতনে ঈদুল ফিতরের ছুটি) = ৭৩ দিন। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহিলা শ্রমিক নিম্নরূপ প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা বাবদ প্রাপ্য হবেন: ৩০ হাজার টাকা ÷ ৭৩ দিন × ১১২ দিন = ৪৬ হাজার ২৭ টাকা। * এখানে উল্লেখ থাকে, একজন শ্রমিক উল্লিখিত তিন মাসে আরও কোনো দিন মজুরীসহ কাজে অনুপস্থিত থাকলে তার প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে।	রহিমা প্রসূতিকল্যাণ সুবিধার ছুটিতে যাওয়ার পূর্ববর্তী মাসে অর্থাৎ জুন মোট মজুরী গ্রহণ করেছেন ১০ হাজার টাকা। এরূপ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট শ্রমিক নিম্নরূপ প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা বাবদ প্রাপ্য হবেন : ১০ হাজার টাকা ÷ ২৬ দিন × ১১২ দিন = ৪৩ হাজার ৭৬ টাকা * এখানে উল্লেখ থাকে, একজন শ্রমিক পূর্ববর্তী মাসে বিনা বেতনে অনুপস্থিতির কারণে যদি কম সাকুল্য মজুরী প্রাপ্য হন অনুরূপ ক্ষেত্রে তার প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা আরও কমে যাবে।

অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে দুজন বহিরাগত বিশেষজ্ঞসহ ৫ সদস্যের কমিটি গঠন বিষয়ে হাইকোর্টের যে নির্দেশনা আছে, তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই এই বিধিমালায়। এ ছাড়াও, ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকে বিধিমালায় বিধিবিধান সংযোজনের মাধ্যমে সহজ করার সুযোগ থাকলেও তা করা হয়নি। এ বিষয়ে শ্রমিকদের দাবি ছিল। শ্রম আদালতের বিচার কার্যক্রম দ্রুত শেষ করার কোনো বিধিবিধানও এতে যুক্ত করা হয়নি।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর নতুন সংযোজিত বিধি ৩৯-ক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নতুন সংযোজিত ৩৯-ক বিধিটি আইনের ৪৮(২) ধারার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

সলিডারিটি সেন্টার বলেছে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা ৪৮(২) ও শ্রম বিধিমালা ৩৯-ক তুলনা করলে দেখা যায়, বিধিমালার নতুন বিধির কারণে একজন মহিলা শ্রমিক শ্রম আইনের ৪৮(২) ধারায় বর্ণিত সুবিধার তুলনায় কম সুবিধা প্রাপ্য হতে পারেন। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। *(পূর্বের পাতায় দেখুন)*

উপরোক্ত উদাহরণ দৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, একজন মহিলা শ্রমিক পূর্বের তুলনায় প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা হিসাবে প্রায় ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ টাকা কম প্রাপ্য হবেন। অন্যদিকে, এটা সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, আইনের বর্ণিত কোনো বিধিবিধানের সাথে বিধিমালার কোনো বিধি সাংঘর্ষিক হলে আইনের বিধান প্রাধান্য পাবে বা কার্যকর থাকবে। অনুরূপ এক্ষেত্রে, বিধিমালার বিধান আইনের পরিপন্থি বিধায় তা কার্যকর হওয়ার সুযোগ নাই। প্রশ্ন হলো, শ্রমবিধির নতুন সংশোধন পুনর্বিবেচনা করা হবে কি না?

পাথরভাঙ্গা শিল্পে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এসআরএস

লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, সিলেট, শেরপুরসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি সীমান্তবর্তী জেলায় পাথর ভাঙ্গার কারখানা রয়েছে। প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক এই কাজে জড়িত। কিন্তু এই শিল্পে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং পরিবেশ রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অনিয়ন্ত্রিতভাবে পাথর ভাঙার ফলে শ্রমিকরা শ্বাসকষ্ট, শ্রবণশক্তি হ্রাস, ফুসফুসের ক্যান্সার, সিলিকোসিস ইত্যাদি জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পাশাপাশি এর কারণে ফসলের ক্ষতি, মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং পরিবেশও দূষিত হচ্ছে। এসআরএস জরিপ অনুযায়ী গত ৬/৭ বছরে ৬৭ জন শ্রমিক সিলিকোসিসে মারা গেছেন এবং প্রতিবছর বহু শ্রমিক আক্রান্ত হচ্ছেন।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য এসআরএস এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) যৌথভাবে বুড়িমারী এবং পাটগ্রাম উপজেলা, লালমনিরহাটে ২০১৬ সাল থেকে স্থানীয় প্রশাসন, মালিক ও শ্রমিকদের সাথে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সভা, প্রচার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য হেল্‌থ ক্যাম্প ইত্যাদি আয়োজন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডাইফ'র প্রস্তাবনা সাপেক্ষে গত ১২ নভেম্বর ২০২২ এ পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা ইউনিয়নে শ্রমিক, মালিক, জনপ্রতিনিধি ও গনমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে পাথরভাঙ্গা শিল্পে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা: সচেতনতা ও করণীয় বিষয়ক এক এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাইফ থেকে মিনা মাসুদ উজ্জামান, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক; জুলিয়া জেসমিন, যুগ্ম মহাপরিদর্শক; মাহফুজুর রহমান ভূইয়া, উপমহাপরিদর্শক, দিনাজপুর; বাংলাবান্ধা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কুদরত-ই-খুদা; ডা: এস এম শরীফ আফজাল, কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সিভিল সার্জন অফিস; মো: রাকিবুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পঞ্চগড় এবং সোহাগ চন্দ্র সাহা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার। এসআরএস'র পক্ষ থেকে সভায় নির্বাহী পরিচালক, আইন কর্মকর্তা ও এ্যাডভোকেসি অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

জিনিসপত্রের উচ্চদামে শ্রমিকরা আধমরা

২০২২ সালের শ্রমিক জীবনের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য। প্রায় প্রতি সপ্তাহে দাম বেড়েছে অধিকাংশ দ্রব্যের। বছরের শেষ দিকে আগস্টে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে ছিল ৯ দশমিক ১০ শতাংশ। আগস্টের মূল্যস্ফীতি ছিল বিগত ১৩৫ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে দেশে ২০১১ সালের মে মাসে ছিল সর্বোচ্চ ১০ দশমিক ২০ শতাংশ মূল্যস্ফীতি।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পেট্রল, অকটেন, ডিজেলসহ জ্বালানি তেলের দাম সাড়ে ৪২ থেকে ৫১ শতাংশ বাড়ানো হয়। এর আগে কখনোই জ্বালানি তেলের দাম এক লাফে এতটা বাড়ানো হয়নি। তাই আগস্ট মাসের শুরু থেকেই নিত্যপণ্যের দাম বাড়তে শুরু করে। নভেম্বরে পুনরায় বাড়ে বিদ্যুতের দাম। এ ছাড়া যাতায়াত, পোশাক, শিক্ষাসামগ্রীর মতো খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের দামও বেড়েছে নিয়মিতভাবে বছরজুড়ে। বছরের শুরুতে ডিমের ডজন ছিল ৯০ টাকা। শেষ দিকে সেটা প্রায় দেড় শ টাকা হয়েছে। হাসের ডিমের ডজন হয়েছে ২০০ টাকা।

আগে চায়ের দোকানে যে রুটি (বনরুটি) ও পিস কেক ৮-১০ টাকা করে বিক্রি হতো, তা এখন ১৫ টাকা হয়েছে। আবার ৩০ টাকা দামের পাউরুটি এখন বিক্রি হচ্ছে ৪০-৪৫ টাকায়; ৪৫ টাকা দামের টা ৬০-৭০ টাকায়। এবছর অনেক পণ্যের মাঝে চিনির দামও রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে। স্থানীয় পরিশোধনকারী মিলগুলোর উৎপাদন খরচ বিবেচনায় নিয়ে সরকার ৬ অক্টোবর কেজিতে দাম ৬ টাকা বাড়িয়ে খোলা চিনি কেজিপ্রতি ৯০ টাকা দর বেঁধে দেয়। বাজারে এই দরে চিনি মিলছিল না মোটেই। খোলা চিনি বিক্রি করা হচ্ছিলো ১০৫ টাকা কেজি দরে। আর প্যাকেটজাত চিনি প্রতি কেজি ৯৫ টাকা নির্ধারণ করে দেয়ার পর বাজারে ঐ চিনির সরবরাহ কমিয়ে দেয় ব্যবসায়ীরা। এভাবে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয় চিনির। পুরো ব্যাপারটাই ঘটে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায়। যদিও ব্যবসায়ীদের দলবদ্ধ ষড়যন্ত্র থামাতে প্রশাসন কিছু করেছে বলে দেখা যায়নি।

বলা বাহুল্য, বাজারে মূল্যস্ফীতি যে হারে বেড়েছে, ছোট ছোট পেশাজীবীদের কারোই মজুরি সেই হারে বাড়েনি– বিশেষ করে শ্রমজীবীদের। জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে, মজুরি সেই হারে না বাড়ায় ভোক্তার প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এতে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। কোন মাসে ১০ শতাংশ দাম বাড়া মানেই যেকারো প্রকৃত মজুরি ১০ শতাংশ কমে যাওয়া। বেপরোয়া দাম বৃদ্ধির মুখে নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোকে বাধ্য হয়ে খাবার কেনা কমাতে হয়েছে।

মূল্যস্ফীতি? না মুদ্রাস্ফীতি?

বছর জুড়ে দাম বাড়ার মুখে একাডেমিক জগতে একটা বিতর্ক ছিল জিনিসপত্রের দাম যে বাড়ছে– সেটা কী সেগুলোর উৎপাদন ব্যয় বাড়ার কারণে– নাকি মুদ্রাস্ফীতির কারণে?

মূল্যস্ফীতি এবং মুদ্রাস্ফীতি– দুই অবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি একই হলেও দুটো ধারণার মধ্যে কিছু ফারাক রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতিতে দেশের বাজারে পণ্যের সরবরাহ অপরিবর্তিত থাকলেও মুদ্রা বা অর্থ সরবরাহ বেড়ে যায়। এ রকম অবস্থায় অনেক বেশি টাকা অল্প পণ্যের পেছনে ধাওয়া করে। তাই পণ্যের চাহিদা ও দাম দুটোই বেড়ে যায়। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির কারণে সব ধরনের পণ্য ও সেবার দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অতিরিক্ত সরবরাহ ঘটলে স্বাভাবিকভাবে অর্থের মূল্য কিংবা ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। তবে মুদ্রাস্ফীতি না থাকলেও কোনো বিশেষ পণ্যের মূল্যস্ফীতি ঘটতে পারে। এমনও দেখা যায়, মুদ্রা সরবরাহ অপরিবর্তিত থাকলেও কোনো একক পণ্যের দাম বেড়ে যায় সেই পণ্যের বাড়তি চাহিদা এবং সরবরাহ ঘাটতির কারণে। আবার কেবল উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি বা অন্য কারণেও মূল্যস্ফীতি ঘটতে পারে। শেষোক্ত কারণগুলোর মাঝে থাকতে পারে সরবরাহ ঘাটতি, সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার ঘাটতি, বাজার সিন্ডিকেটের কারসাজি ইত্যাদি। বাংলাদেশের ২০২২ সালের ঘটনাবলীকে অনেকেই শেষোক্ত শ্রেণিতে রেখেছেন। বিশেষ করে জ্বালানির দাম বাড়ানোর কারণে এবং এই দাম বাড়ানোকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে অনেক পণ্যের ব্যাপক দাম বাড়ানো হয়েছে। ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটগুলো সে কাজটা করেছে বলে অভিযোগ ছিল। বিশ্ব বাজারে জ্বালানির দাম কমলেও এখানে সেটা সময়মতো কমেনি।

প্রথম আলোতে ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর অর্থনীতি বিশ্লেষক ফারুক মঈনউদ্দীন লিখেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ও

ব্যবসায়ীদের নৈতিকতার নিরিখে চাহিদা কিংবা সরবরাহ অনুঘটক না হলেও মূল্যবৃদ্ধির জন্য রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো একটা জুতসই অজুহাতই যথেষ্ট। ভোজ্যতেলের মজুতদারির বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের পর উদ্‌ঘাটিত কর্মকাণ্ড এই অনুমানের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। অনেকের গোপন মজুদে প্রচুর তেল পাওয়া যায়। ডিম নিয়েও ঘটেছিল একই রকমের ঘটনা। এই দুই পণ্যের কোনো ঘাটতি ছিল না বাজারে। এমনকি পবিত্র রমজান মাসে বাজারে বাড়তি অর্থ সরবরাহ না থাকলেও এবং পণ্যের পর্যাপ্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পণ্যের মূল্যস্ফীতি ঘটে কেবল অতিরিক্ত মুনাফার চক্রান্তে।

একই বিষয়ে ডয়েস ভেলের সঙ্গে ২০২২ এর ৪ জুন এক সাক্ষাৎকারে সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যের দাম যা বাড়ছে, তার চেয়ে বেশি বাড়ছে বাংলাদেশের বাজারে। সম্প্রতি কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী খাদ্যপণ্যের ব্যবসায় এসেছেন। তাদের নিয়ন্ত্রণ এতটাই যে, তারা চাইলে পণ্যের সরবরাহ কমিয়ে বা বাড়িয়ে বাজারে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেন। এখন বাজার যারা মনিটরিং করছেন তাদের কাছে হয়ত পর্যাপ্ত তথ্য থাকছে না। মনিটরিংটা আরও জোরদার হওয়া দরকার।'

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের শেষ অর্ধে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির সময় নীতিনির্ধারকদের তরফ থেকে মানুষকে দুর্ভিক্ষের জন্য প্রস্তুত থাকার কথাও বলা হচ্ছিলো। সেসময় প্রথম আলোতে কলাম লেখক মনোজ দে ১৫ আগস্ট একজন শ্রমজীবীর জীবনযুদ্ধের কাহিনী লিখেছেন এভাবে:

'৪০ বছর বয়সী আবদুর রহমান ১৫ বছর ধরে ঢাকায় রিকশা চালান। বাড়ি গাইবান্ধার সাদুল্যাপুরে। স্ত্রী, আট ও ছয় বছর বয়সী দুই সন্তান গ্রামের বাড়িতে থাকে। তিনি ঢাকার রায়েরবাজারে একটি রিকশার গ্যারেজে আরও ১০ জন রিকশাচালকের সঙ্গে থাকেন। গত বছরের নভেম্বরে আগের দফায় জ্বালানি তেলের দাম ২৩ শতাংশ বাড়ার আগপর্যন্ত ঢাকায় ১৫ দিন রিকশা চালিয়ে ১৫ দিন গ্রামের বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে গিয়ে কাটাতেন। এভাবেই চলে আসছিল তাঁর জীবন। নভেম্বরে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার পর ঢাকা-গাইবান্ধার বাসভাড়াসহ জীবনযাত্রার সব ধরনের ব্যয় বেড়ে যায়। ফলে ১৫ দিন ঢাকায় আর ১৫ দিন বাড়িতে থাকার সেই রুটিন ভেঙে ফেলতে বাধ্য হন। এক মাস পরপর বাড়ি গিয়ে সাত দিন থেকে আবার ঢাকায় ফিরতে হচ্ছিল তাঁকে। এবারের ধাক্কায় সেটা কত দিন পরপর হবে, তা তিনি বলতে পারছেন না। বলছিলেন, 'রিকশা চালানো অনেক মেহনতের। একটানা চালাইলে শরীর ভাইঙ্গা যায়। কিন্তু কি করুম, উপায় তো নাই। যেমনে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সংসার চালামু কেমনে। প্যাসেঞ্জারের কাছে বাড়তি ভাড়া চাইলে খ্যাচখ্যাচ করে। তারাও দিবে কোত্থিকা। তাদের কি আয় বাড়ছে?'

১৯ নভেম্বর দৈনিক প্রথম আলো চালের বাজার নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে লিখেছে '২০১৯ সালে একজন শ্রমিক দৈনিক মজুরি দিয়ে ১৩ কেজি চাল কিনতে পারতেন। ২০২২ সালে তা কমে সাড়ে ৮ কেজি হয়েছে।' এই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'কেজিতে ৮ থেকে ১৪ টাকা পর্যন্ত লাভ করছেন চালকল মালিকেরা।' এই লাভের উৎসবের প্রধান এক করুণ শিকার ছিল দেশের শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী।

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বিতর্ক

এই লেখা তৈরির সময় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে সর্বনিম্ন মজুরি চলছিল ৮ হাজার টাকা। যার মধ্যে 'বেসিক' বা মূলবেতন ছিল ৪ হাজার ১০০ টাকা, বাড়ি ভাড়া ২ হাজার ৫০ টাকা এবং অন্যান্য ১ হাজার ৮৫০ টাকা। ২০১৮ সালে এই মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। তার মানে প্রায় সাড়ে চার বছর হলো পোশাক খাতের শ্রমিকরা নতুন মজুরি কাঠামো পায়নি। সুতরাং ২০২৩ হলো এই খাতে মজুর বৃদ্ধির শেষ বছর।

শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারিত হয়। আইনে বিস্তারিত আছে– কীভাবে 'মজুরী বোর্ড' গঠন হবে, কীভাবে কাজ করবে, কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় নেবে এবং কতদিনের মধ্যে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করবে।

তবে বাংলাদেশে কোন পেশার মজুরীর ক্ষেত্রে নিম্নতম মজুরী বোর্ড নিজেরা সেটা নির্ধারণের উদ্যোগ নিতে পারে না। শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে তাদের কাছে প্রস্তাবনা পাঠানোর পর মজুরী বোর্ড কাজ শুরু করে, মতামত নেয় বিভিন্ন তরফ থেকে এবং কিছুদিন পর সুপারিশ প্রদান করে। এইরূপ মজুরি ঘোষণায় রাজনৈতিক বিবেচনাও কাজ করতে দেখা যায়।

বর্তমানে কার্যকর শ্রম আইন অনুযায়ী, প্রতি পাঁচ বছর পর পর নিম্নতম মজুরী পুনর্বিবেচনা করার বিধান। দেশের পোশাক খাতে তাই নতুন করে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের সময় হয়েছে। তবে মজুরি পাঁচ বছর পরই নির্ধারণ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অনেক সময় তিন বছর পরও করা যেতে পারে– যদি শ্রমিকদের জীবনযাপনের ব্যয় বেড়ে যায়। মোটকথা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা, দ্রব্যের মূল্য ও মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করে মজুরি নির্ধারণ করতে হবে এবং সেটা জরুরি হলে যেকোন সময় সেটা হতে পারে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় ৫ বছর হলো প্রতি মজুরি নির্ধারণ দফার মেয়াদ।

এই প্রেক্ষাপটেই প্রশ্ন উঠেছে পোশাক খাতে শ্রমিকদের মজুরি আবার কবে নির্ধারণ হবে এবং সেটা কত হওয়া উচিত? বিশেষ করে মূল্যস্ফীতি প্রায় দুই অঙ্কের ঘর ছুঁয়েছে ২০২২ সালে। সর্বশেষ বছরের মূল্যস্ফীতির সঙ্গে গত চার বছরের মূল্যস্ফীতিকে চক্রবৃদ্ধি হারে হিসাব করলে যেকেউ সহজেই এরকম উপসংহারে পৌঁছাতে পারবেন যে, পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ২০১৮ সালে ৮ হাজার টাকা নির্ধারিত হলেও সেটা প্রকৃতপক্ষে এখন অনেক কমে গেছে। এমনকি বছর শেষে ৫ শতাংশ হারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মজুরি বাড়লেও প্রকৃত মজুরি অনেক কমই হবে– কারণ মূল্যস্ফীতি বাড়ছে তার চেয়ে বড় অংকে। ৫ শতাংশ মজুরি বাড়ানোর বিষয়টিও মালিক সমাজ কারখানা পর্যায়ে অনেক শর্ত সাপেক্ষ করে রেখেছেন। এসব বিবেচনায় বলা যায়, পোশাক খাতের শ্রমিকদের প্রকৃত নিম্নতম মজুরি এখন ৮ হাজার টাকার অনেক অনেক কম। দৈনিক প্রথম আলো ২০২২-এর ২৮ সেপ্টেম্বর লিখেছে:

'পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বিবিএসের খসড়া হিসাবে আগস্ট মাসে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। আর খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্কের ঘরে উঠেছে। এক মাসের মধ্যে প্রায় ৩ শতাংশ হারে মূল্যস্ফীতি বাড়ার তথ্য সরকার প্রকাশ না করলেও সীমিত আয়ের মানুষ ঠিকই তার উত্তাপ পাচ্ছে।'

উল্লেখ্য, মূল্যস্ফীতি দরিদ্রদের জন্য একধরনের নীরব ঘাতকের মতো। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মজুরি বা আয় না বাড়লে সীমিত আয়ের মানুষের ওপর চাপ বাড়ে। তাদের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। পোশাক খাতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে গত সাড়ে চার বছরে। ফলে বর্ধিত মজুরির জন্য শ্রমিক পরিবারগুলোতে এখন হাহাকার বিরাজ করছে। অনেকেই সংসার রক্ষায় অতিরিক্ত ওভারটাইম করছে। যা তাদের শারীরিক শক্তি ও জীবনী শক্তি ক্ষয় করছে। ২০২২ এর ৩১ আগস্ট ঢাকায় এক সেমিনারে গবেষণা সংস্থা সিপিডির গবেষণা পরিচালক গোলাম মোয়াজ্জেম বলেছেন, পোশাক খাতে শ্রমিকের আয়ের তুলনায় ব্যয় সাড়ে ৯ শতাংশ বেড়েছে বলে দেখেছেন তারা। ব্যয় সামলাতে শ্রমিকরা এখন আগের থেকে বেশি কাজ করে।

এদিকে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক পণ্যের অন্যতম ক্রেতা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সংক্রান্ত পার্লামেন্টারি কমিটি বলেছে তারা এখাতের বাংলাদেশী শ্রমিকদের মজুরি বিষয়ে একটা প্রস্তাব দিবে। ২০২২ সালের ১৯ জুলাই এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা। রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে মতপ্রকাশের

স্বাধীনতা এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিশ্চিত করারও আহ্বান জানিয়েছে ইইউ ঐ প্রতিনিধিদল। এরকম অভিমত জানানোর সময় বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ নিযুক্ত ইইউ'র রাষ্ট্রদূত ও হেড অব ডেলিগেশন চার্লস হোয়াইটলিও উপস্থিত ছিলেন। এসব আলাপ-আলোচনার মাঝেই বছর জুড়ে শ্রম খাতে নীরব একটা বিতর্ক চালু ছিল– পোশাক শ্রমিকদের মজুরির প্রশ্ন নিয়ে: কত হওয়া উচিত এ মজুরি।

এরকম বিতর্কে অংশ নিয়ে অনেকেই মতামত দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এরকম আলোচনায় সচরাচর ধরে নেয়া হয়েছে, একজন শ্রমিক বা কর্মজীবী চার জনের একটি পরিবারকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আরও ধরে নেয়া হয়, এই শ্রমিক পরিবারগুলোর বিনোদনের দরকার হয় না। তারা কোন দিন সিনেমা-নাটক দেখে না। তারা কোন দিন দুর্যোগে পড়বে না। তারা কোনদিন মাংস বা ঐ জাতীয় দামী খাবার খাবে না। আত্মীয়-স্বজন কারো কোন দাওয়াতে যাবে না তারা– কারণ তা হলে উপহার কিনতে হবে। তাদের বাড়িতেও কেউ বেড়াতে আসবে না– তাহলে মুরগি জবাই না হোক– চাল তো বেশি লেগে যাবে।

এও ধরে নেয়া হচ্ছে, আলোচ্য পরিবারের শিশুরা স্কুলে যায় না– কারণ তা হলে শিক্ষা খরচ প্রয়োজন হবে। এরকম সকল খরচ বাদ দিয়ে কেবল গবাদিপশুর মতো জীবন যাপনের জন্য একটি পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে একজন শ্রমিকের ন্যূনতম কত টাকা মজুরি প্রয়োজন– সেটাই এসআরএস বিবেচনা করেছে এখানে। তাতে (বক্স হবে) ২০২২ সালের অক্টোবর মাসের বাজারমূল্যে একটি শ্রমিক পরিবারের খরচের নিম্নরূপ চিত্র পাওয়া যায়-

- চাল: দেড় কেজি করে ৩০ দিন (দুই বেলায়; ৫০ টাকা কেজি হিসাবে) = ৩০ x ৭৫= ২,২৫০ টাকা
- মাছ-তরকারী-তেল-লবণ-হলুদ-মরিচ ইত্যাদি: দৈনিক ৫০+৪০+২০+৫+১৫ টাকা হিসাবে = ৩০ x ১৩০ = ৩,৯০০ টাকা।
- চিকিৎসা, ওষুধ, সাবান, তেল ইত্যাদি = মাসে জনপ্রতি গড়ে ২০০ টাকা হিসাবে = ২০০ x ৪ = ৮০০ টাকা।
- বিদ্যুত-পানি-গ্যাস বিল [৫০০+৫০০+১০০০] + বাড়ি ভাড়া [৪০০০] = ৬,০০০ টাকা
- পোশাক [জনপ্রতি মাসে গড়ে ১০০ টাকা হিসাবে] = ৪০০ টাকা
- যাতায়ত [পুরো পরিবারের জন্য দিনে ৫০ টাকা করে] = ৫০ x ৩০= ১,৫০০ টাকা
- সকালের (এবং বিকালের?) নাস্তা খরচ [দিনে চার জনের জন্য ২০ টাকা হিসাবে] = ৪ x ২০ x ৩০= ২৪০০ টাকা;
- মোবাইল ফোন খরচ: দিনে ১০ টাকা হিসাবে= ৩০০ টাকা

ন্যূনতম মোট প্রয়োজন = ১৭,৫৫০ টাকা।

আগেই বলা হয়েছে উপরোক্ত হিসাবে বড় আকারের চিকিৎসা খরচ, চিত্তবিনোদনের খরচ, গ্রামের বাড়িতে আসা-যাওয়ার খরচ, মাংসের মতো দামী খাবার খরচ, শিক্ষা খরচ ইত্যাদি বহু ধরনের খরচ অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা হলো 'ন্যূনতম খরচে'র একটা হিসাব।

প্রশ্ন হলো, উপরোক্ত হিসাবের আলোকে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কত হওয়া উচিত এখন? ২০২৩ সালে বাংলাদেশ হয়তো প্রবলভাবে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরবে। কারণ ইতোমধ্যে পোশাক খাতে নূন্যতম মজুরি নির্ধারণের ৫ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে।

ইজিবাইক বিরোধী প্রচারণা অব্যাহত

ইজিবাইকের প্রচলন ঘটেছিল শরীরচালিত রিকসার বিকল্প হিসেবে। দ্রুত এটা দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বহুমানুষ একে কর্মসংস্থানের বিকল্প হিসেবে নিয়েছে। আবার গ্রাম-গঞ্জের যাত্রীরাও এর প্রচলনকে ইতিবাচকভাবেই নিয়েছে। কিন্তু শুরু থেকে এই বাহন ডিজেল, পেট্রোল নির্ভর পরিবহন সেক্টরের অসহযোগিতার শিকার হতে থাকে। পুরানো পরিবহন সেক্টরের মালিক ও কর্মীরা ইজিবাইককে সড়কের খলচরিত্র হিসেবে চিত্রায়িত করতে উঠে পড়ে লাগে। তার ছাপ পড়ে সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলেও। বড় বড় পরিবহন মালিকরা বর্তমানে দেশে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় নীতিনির্ধারণী পরিসরে এবং মিডিয়া জগতেও ইজিবাইককে ক্রমাগত বিরূপ নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের মুখে পড়তে হয়েছে। ২০২২ সালেও এই পরিবেশ অব্যাহত ছিল। অথচ ইজিবাইক আমদানি ও বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা নেই।

দেশের বিভিন্ন জেলায় বিগত বছরজুড়ে নিয়মিতভাবে ইজিবাইক মালিক ও চালকরা অপপ্রচার ও হয়রানি বন্ধ এবং তাদের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সের দাবিতে মিছিল-মিটিং করেছে। তাদের এরকম দাবিও উত্থাপন করতে দেখা যায় যে, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযান নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী তাদের সনদ দেয়া হোক। এই খসড়া নীতিমালায় ছিল মোটরচালিত অটোরিকশা, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি বন্ধ না করে এগুলো চলাচলের এলাকা নির্ধারণ করে দেবে সরকার। একইসঙ্গে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি (আরটিসি) এসব যানের সংখ্যা বেঁধে দেবে বা সিলিং নির্ধারণ করে দেবে। সে অনুযায়ী নিবন্ধন দেবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। এছাড়া এসব যানের ভাড়াও নির্ধারণ করে দেয়া হবে। সরকার যখন এরকম একটা নীতিমালা করার দিকে এগোচ্ছিলো তখন একই সময় দেশব্যাপী ইজিবাইক বিরোধী নিয়মিত প্রচারণার কয়েকটা ছিল– 'এরা বিদ্যুতের ঘাটতি তৈরি করছে'; 'এসব যানবাহন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী'; 'এরা দুর্ঘটনা ঘটায়'; 'এরা রেজিস্ট্রেশন নেয়নি' ইত্যাদি।

২০২২-এর ২৫ জানুয়ারি 'বাংলাদেশের খবর' নামের একটা পোর্টাল লিখেছে: 'ব্যাটারিচালিত অটো-রিকশা ইজিবাইক গিলে খাচ্ছে বিদ্যুত'। এরকম প্রতিবেদনের একটা পরোক্ষ মানে এও দাঁড়ায় যে, গরীব মানুষদের বিদ্যুত ব্যবহার করতে নেই। বিদ্যুৎ শুধু ধনীদের ফ্রিজ-এসি চালানোর জন্য। এসব প্রচারণায় এমনও মনে হয় ইজিবাইক চালকরা বিনামূল্যে বিদ্যুত ব্যবহার করছে। স্পষ্টতই এধরনের প্রচারণার মধ্যে এক ধরনের শ্রেণীযুদ্ধের ছাপ রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যুত ব্যবহারের সকল পরিসংখ্যানে যে এসি ও ফ্রিজ ব্যবহারকারী শহুরে ধনাঢ্যরাই এগিয়ে সেটাও আড়াল করে উপরোক্ত ধরনের প্রতিবেদন।

ইজিবাইকের বিরুদ্ধে যানজটের অভিযোগও নিয়মিতই ওঠে। কিন্তু রাজধানী ঢাকার রাস্তায় ইজিবাইক না থাকার পরও নিয়মিত আমরা ভয়াবহ যানজট হতে দেখছি। অন্যদিকে, দেশের যেসব সড়কে ইজিবাইক নেই সেখানে নিয়মিতই দুর্ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি সড়ক দুর্ঘটনার যে মহামারি চলছে তার বড় এক কারণ মটর সাইকেলের আধিক্য ও বেপরোয়া চালনা।

ইজিবাইকের রেজিস্ট্রেশন না নেয়ার অভিযোগও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ নতুন চালু হওয়া কোন যানবাহন নথিভুক্ত করা সরকারি বিশেষ বিভাগের কাজ। যানবাহনের চালক বা মালিকরা জোরপূর্বক এটা করতে পারেন না। এসব বিষয় ইজিবাইক বিরোধী বিরূপ প্রচারক দল আড়াল করেই তাদের কাজ অব্যাহত রেখেছে বলে দেখা যায় এবং প্রায়ই দুর্ঘটনা ও যানজটের জন্য ভিলেন সাব্যস্ত করা হচ্ছে ইজিবাইককে। অতীতে ঢাকায় সড়কগুলোতে রিকসা চলাচল বন্ধে তাকে শহরের যাবতীয় অনাচারের জন্য দায়ী করতো কিছু মিডিয়া। তাদের সেই প্রচারণা ব্যর্থ হয়নি। ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ অনেক সড়কে এখন আর রিকসা চলে না। তাতে প্রাইভেট যানবাহনের বেশ সুবিধা হয়েছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিম্ন আয়ের যাত্রীরা, বৃদ্ধরা এবং শিশুরা। এছাড়া ঐসব সড়কে প্রাইভেট কার মালিক ও চালকদের সুবিধাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রিকসার জায়গা দখল করে নিয়েছে লাগামহীনভাবে বেড়ে চলা যন্ত্রচালিত প্রাইভেট গাড়ি। যানজটে অফিস সময়ে ঢাকা প্রায় অচল হয়েই থাকে এখন।

তবে সেই অভিজ্ঞতার পরও গরীবদের বাহন ইজিবাইক বিরোধী তৎপরতা থেমে নেই। ইজিবাইক বিরোধী এই প্রচার

কার্যক্রম নিয়ে ২০২২-এর ২৫ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোতে মাহা মির্জার দীর্ঘ এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি ইজিবাইক বিরোধী নানান তৎপরতাকে 'গরীব মানুষের প্রতি পদ্ধতিগত অন্যায়' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি লিখেছেন:

গাজীপুরের বাটাগেট, টিঅ্যান্ডটি মাঠ এখন ইজিবাইক ধরপাকড়ের বিশাল গোডাউনে পরিণত হয়েছে। এসব মাঠে সব মিলিয়ে আটকে রাখা আছে প্রায় ছয় হাজার ইঞ্জিনচালিত রিকশা আর ইজিবাইক। অর্থাৎ ছয় হাজার রিকশাচালক, ভ্যানচালক আর ইজিবাইকচালকের কয়েক মাস ধরে কোনো রোজগার নেই। অতিরিক্ত যানজটের কারণে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ নাকি এই ধরপাকড় করেছে।... বিশেষজ্ঞদের বারবার চিহ্নিত করে দেওয়া যানজটের কাঠামোগত কারণগুলোকে এড়িয়ে, যানজটের প্রধান 'খলনায়ক' হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে খেটে খাওয়া নিরীহ ইজিবাইক চালকদের। ১০ বছর ধরে গাজীপুরের রাস্তাগুলোতে মেগা প্রকল্প নির্মাণের কাজ চলছে, ভয়াবহ যানজটে মানুষ অতিষ্ঠ, সেই মেগা প্রকল্পের মেগা জট লাগানোর দায়ও যেন ছোট ইজিবাইক চালকের? বিদ্যুত খাতের এক দশকের ভয়াবহ হরিলুটের বাস্তবতা এড়িয়ে একজন অটোরিকশাচালককে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে 'বিদ্যুৎখেকো' হিসেবে। অর্থাৎ ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষকে টোকাটি না দিয়ে ক্ষমতাহীন, কাজ না পাওয়া লোকদের বিরুদ্ধে একের পর এক রায় দিয়ে গেল এ দেশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত ধাঁচের পুনঃপুন অপপ্রচারের কারণেই হয়তোবা ইজিবাইক মালিক ও চালকদের গাড়ি ডাম্পিংয়ের ভয়ের মুখে নিয়মিত চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, অপহরণের শিকার হতে হয় বলে চালকরা অভিযোগ তুলে থাকেন। কেবল পেশাগত দিক থেকে নয়– মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিক থেকেও ইজিবাইক চালকরা নীরবে চলতে থাকা এক অন্যায় পরিস্থিতির শিকার।

ইজিবাইক ও রিকশা-ভ্যান চালকদের কিছু দাবি

ইজিবাইক চালকদের দাবিসমূহের মধ্যে রয়েছে: রিকশা-ভ্যান, ইজিবাইক আটক, হয়রানি বন্ধ, বুয়েট প্রস্তাবিত মডেলে ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান আধুনিকায়ন করে লাইসেন্স প্রদান, বিভিন্ন রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক চলাচলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, পৌরসভাকর্মী ও আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী কর্মীদের অমানবিক আচরণ, চাকায় পেরেক মারা, হাওয়া ছেড়ে দেওয়াসহ যাবতীয় হয়রানি বন্ধ, রিকশা-ভ্যান, ইজিবাইক চালকের জন্য পণ্য রেশনিং ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইককে গণপরিবহন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া, প্রকৃত চালকদের চিহ্নিত করে লাইসেন্স প্রদান, নির্ধারিত স্থানে স্ট্যান্ড নির্ধারণ করা, বিআরটিএ কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান, সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষদের মতো রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক চালকদের নাগরিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

বগুড়ার হালকা প্রকৌশল শিল্পের শ্রমিকরা প্রাতিষ্ঠানিক খাতের মর্যাদা চায়

বাংলাদেশে শিল্পায়নের ব্যাপক চেষ্টা চলছে। কিন্তু সেই চেষ্টায় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা যতটা কদর পায় দেশী উদ্যোক্তাদের সহায়তা সেরকম নয়। এর বড় এক নজির বগুড়ার হালকা প্রকৌশল শিল্প। একসময় ঢাকায় ধোলাইখাল এলাকায় এই শিল্পের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হলেও এখন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি বগুড়াকে ঘিরে এই খাতের বড় এক বিকাশ ঘটেছে।

বগুড়া জুঁড়ে লোহ-লক্কড়ের প্রচুর ওয়ার্কশপ এখন। সেই সূত্রে হালকা প্রকৌশল শিল্প ইতোমধ্যে পুরো অঞ্চলে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। স্থানীয়ভাবে ধারণা করা হয় প্রায় ৫ লাখ মানুষ এখানে কোন না কোনভাবে এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। যা এই খাতের সঙ্গে যুক্ত দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

উৎপাদনের পাশাপাশি বিপনন খাতেও এই শিল্প দেশজুড়ে অনেকের কাজের সুযোগ তৈরি করেছে। কামারশালা থেকে এগোতে এগোতে বগুড়ার এই খাত এতদূর আসলো।

যেভাবে শুরু

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতোই বগুড়ায় লোহালক্কড় নিয়ে গৃহস্থালী নানান জিনিসপত্র বানাতেন ধলু মেকানিক, আফসার মিয়া, মজিবর রহমানসহ অনেক কারিগর। অন্য জেলা থেকে বগুড়ার এই কারিগরদের ফারাক ছিল, তারা হালকা যন্ত্রপাতির সামাজিক চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোতে চাইতেন। সেই সূত্রেই বগুড়ায় এই 'বিপ্লব' ঘটে যায়। ইট ভাঙ্গার মেশিন থেকে শুরু করে পাটের ছাল ছাড়ানোর যন্ত্র– কী উদ্ভাবন হয়নি বগুড়ায়। সেচ পাম্প, টিউবয়েলের আনুষঙ্গিক ইত্যাদি অনেক আগে থেকেই হয়েছে এখানে।

এই খাতকে ঘিরে বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষিখাতের আধুনিকায়নের সঙ্গে সঙ্গে হালকা যন্ত্রপাতির চাহিদা বাড়ছে। এই চাহিদার বড় অংশ পূরণ করছে বা করতে সমর্থ বগুড়ার কারিগররা। কিছু যৌথ বিনিয়োগেরও প্রস্তাব আছে এখানে। এখানকার পণ্যের প্রতি দেশের বাইরের ক্রেতারাও আগ্রহ দেখাচ্ছে। চলতি বিশ্বে হালকা প্রকৌশল শিল্পের বাজার রয়েছে প্রায় ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের সমান। আর বাংলাদেশে এর বাজার রয়েছে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের।

বর্তমানে কেবল দেশীয় বাজার চাহিদার তিন ভাগের এক ভাগ যোগান দিতে পারে দেশীয় উৎপাদকরা। একই সঙ্গে চীনের সঙ্গে অসম এক প্রতিযোগিতায় আছে এই খাত। বগুড়ার এই খাতের বিকাশের সঙ্গে বাংলাদেশের কৃষিখাতের বিকাশের সম্ভাবনাও এখন অনেকখানি জড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ড্রাস্ট্রিজ ওনার্স এসোসিয়েশনের এক হিসাবে বাংলাদেশ যদি হালকা যন্ত্রপাতির বৈশ্বিক বাজারের মাত্র এক শতাংশ ধরতে পারে– সেটাও হবে সাত বিলিয়ন ডলারের বাজার।

এমুহূর্তে বগুড়ার বিভিন্ন স্থানে এখন কয়েক শ' ওয়ার্কশপ আছে। বলা যায়, কিছুটা অপরিকল্পিতভাবেই এই শিল্পের বিকাশ ঘটেছে সেখানে। আয়তন বাড়ার পাশাপাশি এই শিল্পে সমস্যাও বাড়ছে। প্রথম দিকের কারখানাগুলোর সমৃদ্ধি দেখে পরের প্রজন্মে অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে ওয়ার্কশপ গড়ার ধুম পড়েছিল। অল্প মজুরিতে শ্রমিক পাওয়াও এখাতে বিনিয়োগকে বেশ উৎসাহিত করেছে। এখন অবশ্য কম উৎপাদনশীলতার সমস্যার কথা বলছেন বিনিয়োগকারীরা। কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও কারখানা অবকাঠামোর উন্নয়ন হয়নি। একই ধরনের বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে এরকম প্রশিক্ষণ অবকাঠামো জরুরি। পুরানো অনেক শ্রমিক দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা সম্বল করে নিজেরাও ছোট আয়তনে কারখানা খুলেছেন। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহায়তা পেলে তারা অনেক দূর যেতে পারতেন। জাতীয়ভাবে বিআইডিএস ২০২২ সালের আগস্টে 'লেবার মার্কেট স্টাডিজ ফর এসইআইপি অন স্কিল ডিমান্ড, সাপ্লাই অ্যান্ড মিসম্যাচ' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে উল্লেখ করেছে– হালকা প্রকৌশল খাতে উচ্চতর দক্ষ লোকের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

দ্বিতীয়ত এই খাতের গুণগত ও পরিমাণগত বিকাশের জন্য কাঁচামালের যোগান পাওয়া এবং বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালে দেশে একটা ভালো উদ্যোগ দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় কৃষিখাতের যন্ত্রপাতি তৈরিকারী হালকা প্রকৌশল শিল্পের কর্মীদের ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ শুরু হয়েছে দেশব্যাপী। আপাতত বগুড়ার বাইরে হলেও এরকম আয়োজন বগুড়াতে বিশেষভাবে দরকার।

এই খাতের আধুনিকায়নে সরকারের দিক থেকে প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা দরকার। সরকার বলছে তারা এখানে একটা শিল্পপার্কও করবে। ২০২২-এর জাতীয় শিল্পনীতিতে (অধ্যায়-৪) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উন্নয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

শ্রমিকরা ভালো নেই

বগুড়ার এই শিল্পখাতে বিভিন্নভাবে যুক্ত শ্রমিক সংখ্যা হবে প্রায় ২০ হাজার। এদের বড় এক অংশ চুক্তিভিত্তিক কাজ করে। হালকা প্রকৌশল শিল্প নিয়ে যখনি নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে কোন আলাপ হয় তখন পুঁজি বিনিয়োগ, বাজার সুবিধা, রফতানি ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠলেও এখাতের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের বিষয়টি বরাবরই আড়ালে থাকে। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললেই অল্প মজুরির সমস্যার কথা জানান তাঁরা। মজুরি প্রশ্ন ছাড়াও এই খাতের শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক করণীয় আছে সরকারি-বেসরকারি তরফে। পুরো খাতটি শ্রম আইনে 'অপ্রাতিষ্ঠানিক' খাত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় এখানে শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য কোন সংঘ শক্তি গড়ে উঠেনি। আবার অনেকাংশে শ্রম আইনের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত এ খাত। ফলে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের কার্যকর লড়াই, উদ্যোগ এবং সামর্থ্যও কম। অর্থনৈতিক বিবেচনায়, বিনিয়োগে, শ্রমিক সংখ্যার ব্যাপকতায় এত বড় একটা খাতকে যেভাবে 'অপ্রাতিষ্ঠানিক' বিবেচনা করা হচ্ছে তা বিস্ময়কর। বিশাল শিল্পখাত হলেও জাতীয়ভাবে রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর কাছে হালকা প্রকৌশল খাতের শ্রমিকরা প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পাচ্ছে না আজও।

এদিকে ২০২২-এ জাতীয় শিল্পনীতির খসড়ায় বলা হয়েছে জাতীয় আয়ে বর্তমানে শিল্প খাতের অবদান ৩৭ শতাংশ। হালকা প্রকৌশল খাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে এটি ৪০ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব। সেজন্য সরকার এ খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যাপ্ত সহায়তা করবে এবং ইউটিলিটি সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহও নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেবে (বণিকবার্তা, ৬ অক্টোবর ২০২২)। এ খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আগস্টে সরকার 'হালকা প্রকৌশল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০২২' এর খসড়ার অনুমোদন দেয়। এই অনুমোদনের সময় সরকার জানায় যে, প্রায় ৪০ হাজার হালকা প্রকৌশল শিল্প রয়েছে দেশে।

এই বিপুল শিল্প-উদ্যোগকে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে প্রকৌশল যন্ত্রপাতির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ অনায়াসে স্বাবলম্বী হতে পারে। তবে এরকম উন্নয়নে এ খাতের শ্রমিকদের ঋণও বিবেচনায় রাখতে হবে।

জ্বালানির দাম বৃদ্ধি সমুদ্রগামী জেলেদের খরচ বাড়িয়েছে

কক্সবাজার থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বাংলাদেশের উপকূলজুড়ে কত জেলে আছে তার নির্ভরযোগ্য কোন পরিসংখ্যান নেই আজও। তবে সংখ্যাটা প্রায় ১৩ লাখ বলে উল্লিখিত হয়। উপকূলীয় সব জেলাতেই জেলেদের বসতি আছে। আবার দেশের অভ্যন্তরীণ জেলাগুলোতেও জেলেরা আছেন। উভয়ের কাজের ধরনে কিছুটা ফারাকও আছে।

উপকূলীয় জেলেদের বড় এক বৈশিষ্ট্য তাদের নিয়ন্ত্রক হলো ট্রলার মালিকরা– জেলেরা যাদের বলে 'কোম্পানি'। জেলে-জীবন অনেকটাই এই কোম্পানিদের দাস; সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাগরের লাগামহীন জলদস্যুতা, নানান আদলে ঋণ ব্যবসায়ীদের বাঁধন, উপকূলীয় বনরক্ষীদের চাঁদাবাজি এবং প্রকৃতির ক্রমবর্ধমান আক্রোশ। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'মালোপাড়া' যেমন প্রকৃতি ও নিয়তির বেদীতে হারিয়ে গিয়েছিল একদিন– উপকূলীয় আজকের মৎস্যজীবীরাও জাতীয় অর্থনীতির বিশাল অংশীদার হয়েও স্রেফ নিয়তিবাদী জনগোষ্ঠী হয়ে ধুঁকছে।

প্রায় বর্ষাতেই দেশজুড়ে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরা আফসোস করেন উচ্চদামের কারণে ইলিশ কিনতে পারেন না বলে। কিন্তু বিভিন্ন মৌসুমে যখন ইলিশে উপচে পড়ে মোকামগুলো, তখনও যে জেলেপাড়ার অর্থনীতি খুব বেশি পাল্টায় না সেটা জানে না ইলিশের শহুরে ভোক্তা। এমনকি বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে ব্যাপক প্রবৃদ্ধির পরও ঐ জেলেদের জীবনে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগছে না।

২০২১ সালের ৪ এপ্রিল প্রথম আলোর এক হিসাবে দেখা যায় কেবল কক্সবাজারে ৬ হাজার ছোট-বড় ট্রলার আছে। শ্রমিক আছেন লক্ষাধিক। ইলিশ বন্ধের মৌসুমে এঁদের সবাই সরকারি সহায়তা পান না। সবাই নিবন্ধিতও নন। অনিবন্ধিত মৎস্যজীবীরা মাছ উৎপাদন বন্ধের সময় কী করবেন? তাদের সন্তানের পড়াশোনার দিকটা কে দেখবে? এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ কে নিবে?

শহরের বাজারে সস্তায় ইলিশ না পেয়েও নাগরিক ভোক্তা অন্যভাবে রসনা তৃপ্ত করতে পারে, জেলেরা তেমন পারে না। সাগর থেকে মাঝে মাঝেই খালি ট্রলার এনে জেলেদের দ্বারস্থ হতে হয় 'কোম্পানি'র কাছে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে ঋণ করে যায় তারা। শর্ত থাকে, সুদে-আসলে এই ঋণ যতদিন শোধ না হবে ততদিন 'অন্যের ট্রলারে উঠতে পারবে না।'

সংসারের আয়তন বাড়লেও সাগরে আর আগের মতো মাছ মেলে না। ডিজেলের দাম বাড়ায় ট্রলার নিয়ে সাগরে থাকারও খরচ বেড়েছে। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর এরকম দরবৃদ্ধিতে 'কোম্পানি'র সঙ্গে জেলেদের ঋণের হিসাবও মিটমাট হয় না কখনও। প্রায় এলাকাতেই অধিকাংশ জেলে যুগের পর যুগ 'কোম্পানির কাছে বাঁধা ঋণের জালে। অন্যদিকে, শিক্ষা ও সংঘশক্তির দুর্বলতায় সুদ-আসলের হিসাব আর 'কোম্পানি'র সঙ্গে দরকষাকষিতেও তাদের দুর্বলতা কাটে না। অনেকের পরিচয়পত্র, নিয়োগপত্র কিছুই থাকে না; কাজ হারিয়ে ফেলার ঝুঁকি সার্বক্ষণিক। দেশের শ্রম পরিস্থিতিকে বিনিয়োগবান্ধব রাখতে গিয়ে শোষণের আদিম পটভূমি টিকে আছে এভাবেই।

পরিচয়পত্র না থাকার আরেক বিপজ্জনক ফল, সাগরে ভুল করে অন্য দেশের সীমানায় ঢুকে পড়ামাত্রই চিহ্নিত হতে হয় 'দস্যু' হিসেবে। এভাবে বহু বাংলাদেশি বন্দি হয় ভারত ও মিয়ানমারের হাতে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তদবিরের উপর ভরসা করতে হয় তখন এরকম উপকূলীয় কৈবর্ত পরিবারদের।

জেলে পরিবারগুলোতে আয়-রোজগারের এত টানাপড়েন থাকে, সমুদ্রে যাওয়ার আগে আবহাওয়া বার্তা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার মানসিকতায় থাকে না কেউ। সত্যিকারের বার্তাই-বা পাওয়া যাবে কোথায়? ২০০৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর যে ঝড়ে প্রায় এক হাজার ট্রলার নিখোঁজ হয়েছিল সেদিন জাতীয় দৈনিকগুলোতে আবহাওয়া সংবাদ ছিল নিম্নরূপ :

'আজ সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে– রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ঢাকার কয়েকটি স্থানে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং অস্থায়ী ঝড়ো বাতাস বইতে পারে। দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে।'

বাস্তবে সেদিন উপকূলীয় এলাকায় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২০০-৩০০ কিলোমিটার। সেই ঝড়ে পড়ে অন্তত এক হাজার ট্রলার ডুবেছে। মানুষ মারা গেছে প্রায় পাঁচশ। ট্রলার যে পরিমাণ ডুবেছে সে তুলনায় মানুষ মারা গেছে কম, কারণ অনেকে সুন্দরবন উপকূলের কাছাকাছি এসে ট্রলার হারিয়ে সাঁতরিয়ে ডাঙায় এসেছিল। এভাবে প্রতিটি নতুন ঝড় মানেই

উপকূলীয় জেলেপল্লীতে কিছু মানুষের হারিয়ে যাওয়া; বাকিদের দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব।

২০০৬-এর ব্যাপকতায় না হলেও প্রতি বছর সাগরে নিম্নচাপ ও ঝড় হচ্ছে; জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এরূপ প্রাকৃতিক অরাজকতার হার ও তীব্রতা দুটিই বেড়েছে।

রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম অনুযায়ী ট্রলারে বয়া, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি থাকা অপরিহার্য হলেও বাস্তবে এসব থাকে সামান্যই। সমুদ্রগামী ট্রলারের নিরাপত্তা অবকাঠামো দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রে বিশেষ বিভাগের। অজ্ঞাত বিবেচনায় এই প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় রাখা হয়েছে উপকূল থেকে অনেক দূরে। ট্রলার মালিকদের ওপর এই প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ সামান্যই। সমুদ্রে ট্রলার চালকদের সুবিধার জন্য তীর ও ডুবোচর চিহ্নিত করা, পর্যাপ্ত সিগন্যাল বাতি স্থাপন ইত্যাদি কাজে সমুদ্র পরিবহন অধিদফতরের প্রয়োজনীয় সেবা বাড়ানো দরকার বলে দাবি জেলেদের।

অনেক সময়ই সরকারের বিশেষ বিভাগের দেওয়া একটি লাইসেন্সের বিপরীতে ট্রলার চলে অনেক কয়টি। এরূপ অবস্থায় ঝড়ে জেলে মাত্রই যে নিয়তির কাছে সমর্পিত থাকবে সে আর বিচিত্র কী– যে জেলেদের মাঝে অন্তত ১০-১৫ শতাংশ থাকে কিশোরও। প্রায় প্রতি সমুদ্রগামী ট্রলারে ১-২ জন করে কিশোরকে শিক্ষানবিশ রাখা হয়। ঝড়ের দিনে এরাই হয় প্রকৃতির প্রথম শিকার। কক্সবাজার সন্নিহিত এলাকায় জেলেদের মাঝে বিরাট সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ। সে কারণে মারা গেলে স্থানীয় প্রশাসন মৃত হিসেবেও তাদের শনাক্ত করতে নারাজ। কারণ 'রাষ্ট্র'-এর কাছে রোহিঙ্গারা বহিরাগত।

প্রকৃতির আক্রোশ আর রাষ্ট্রের উদাসীনতাই নয়, সাগরে জলদস্যুদের দ্বারাও জেলে সমাজ বিড়ম্বিত। উপকূলজুড়ে মাঝে মাঝে ডাকাতির ঘটনা শোনা যায়। দস্যুরা ট্রলার থেকে জাল, মাছ ও জ্বালানি তেল লুটে নেয় এবং নির্মম নির্যাতন করে তখন জেলেদের ফেলে দেয় সাগরে। অনেক সময় জেলেদের অপহরণ করেও নিয়ে যাওয়া হয় মুক্তিপণের দাবিতে।

বাংলাদেশে সমুদ্র নিরাপত্তার জন্য আগে নৌবাহিনী ছিল, এখন সঙ্গে যোগ হয়েছে কোস্টগার্ড। জেলেদের নিরাপত্তায় এসব বাহিনীর অনেক অবদান আছে। তবে তাঁদের দিক থেকে আরও অনেক কিছু করা দরকার। মোবাইল ফোন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে অনায়াসে সাগরগামী জেলেদের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো যায় এবং সেক্ষেত্রে নিরুদ্বেগ সাহসী জেলেরা দেশবাসীকে আরও বেশি রূপালি সম্পদের জোগান দিতে পারত। ইদানীং মাঝে মধ্যে সমুদ্রের পাশের নদীতেও জেলেদের ওপর ডাকাতদের হানা শুরু হয়েছে।

নদী বা সাগরবক্ষে যেমন জেলেরা দস্যুদের দ্বারা আর্থিক ও শারীরিকভাবে নিগৃহীত তেমনি নতুন উপদ্রব হিসেবে যোগ হয়েছে বনরক্ষী নামের চাঁদাবাজি। বলাবাহুল্য, ডাকাতের অপহরণের টাকা কিংবা বনরক্ষীর চাঁদা– এসব দিতে হয় সমুদ্রগামী জেলেকেই, ট্রলারের মালিককে নয়। ফলে ১৭-১৮ জন লোকের একটি দলের ১০-১৫ দিনের একটি ট্রিপ শেষে যা আয় হয় তা শেষ হয়ে যায় ট্রিপের আগে নেওয়া ঋণ শোধ করতে।

যারা একই সঙ্গে ট্রলারের মালিক এবং নিজেই ট্রলারে মাঝির কাজ করে তাদের অবস্থা সাধারণ জেলেদের চেয়ে একধাপ ভালো হলেও কোনো ট্রিপে মাছ পাওয়া না গেলে তাদেরও ঋণ করতে হয় আড়তদারের কাছ থেকে। অনিবার্যভাবে তখন পরের ট্রিপের মাছ বিক্রি করতে হয় ওই আড়তেই। এভাবে ঋণের জালে জড়িয়ে থাকে 'ছোট কোম্পানি'রাও। বরগুনার পাথরঘাটা, পটুয়াখালীর মহিপুর, ভোলার দৌলতখান– সর্বত্র একই চিত্র।

দেশের সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জেলেদের প্রত্যাশা– ঋণের অক্টোপাস থেকে তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে এরা। মাছ ধরা, বিপণন, সংরক্ষণ ইত্যাদি মিলে এটা বিশাল আর্থিক সেক্টর হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য সরকার নির্ধারিত কোনো মজুরি কাঠামো নেই। এক্ষেত্রেও অবিলম্বে সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। বর্তমানে মজুরি কাঠামো রয়েছে কেবল ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ফিশিং ট্রলারে। অন্যদের 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ অবস্থা বদলানো দরকার।

মজুরি কাঠামোর পাশাপাশি প্রয়োজন ট্রলার ও জেলেদের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা এবং যেখানে বীমা আছে সেখানে সেটার সুবিধা যাতে ভুক্তভোগীরা প্রকৃতই পায় সে ব্যবস্থা করা। এসব বিষয়ে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য যেরকম সংগঠন-চিন্তা ও রাজনৈতিক বোধ থাকা জরুরি জেলেদের সেটা নেই। এই বাস্তবতা বদলানোর বার্তা নিয়ে পার হচ্ছে ২০২২ সাল।

আন্দোলন করে ৫০ টাকা মজুরি বাড়ালো চা শ্রমিকরা

২০২২ সালের বাংলাদেশে শিল্প ও শ্রমিক অঙ্গনে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল চা বাগানগুলোতে মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন। ৯ আগস্ট শুরু হয়ে প্রায় ১৮ দিন এই আন্দোলন স্থায়ী হয়। আন্দোলনের ভেতর দিয়ে প্রত্যাশামতো দাবি আদায় না হলেও শ্রমিকরা দৈনিক মজুরি ৫০ টাকা বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়।

আগস্টে এই আন্দোলন শুরু হয়। তাৎক্ষণিকভাবে দেশের প্রায় সকল চা বাগানে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৬ আগস্ট থেকে শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দেয়। তার আগে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চার দিন দুই ঘন্টা করে কর্মবিরতি পালন করা হয়। শুরুতে শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এক চিঠিতে 'আলোচনা চলা অবস্থায় আন্দোলন করা' এবং ধর্মঘটে যাওয়াকে 'অবৈধ' আখ্যা দিয়েছিলেন। এছাড়া মালিকদের সংগঠন 'চা সংসদ' দাবি করেছিল ১২০ টাকা মজুরিতেই বাগিচা শ্রমিকরা ভালো আছে।

আগস্ট আন্দোলনের পটভূমি

প্রথা অনুযায়ী, প্রতি দুই বছর পরপর মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ চা-সংসদ ও একই খাতের শ্রমজীবীদের সংগঠন বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ও দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করে। কিন্তু সর্বশেষ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে। এরপর ১৯ মাসে দুই পক্ষের মধ্যে ১৩টি বৈঠক হলেও নতুন মজুরি নির্ধারিত হয়নি। এর ফলেই আগস্ট আন্দোলনের সূচনা।

বাংলাদেশের সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কাঠামোগত এক নির্মম প্রতীক যে চা শ্রমিকরা তা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে দৈনিক যুগান্তরে ২০২২ সালের ২২ আগস্ট আন্দোলন চলাকালে প্রকাশিত একটি তথ্যে। যেখানে দেখা যায়: 'দেশে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২ হাজার ৮২৪ ডলার অর্থাৎ ২ লাখ ৬৮ হাজার ২৮০ টাকা হলেও চা শ্রমিকদের বার্ষিক আয় মাত্র ৪৩ হাজার ২০০ টাকা।' অর্থাৎ চা শ্রমিকদের বার্ষিক গড় আয় জাতীয় গড় আয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগও নয়।

আন্দোলনের চাওয়া ছিল দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা করা

২০২২ সালের আগস্ট আন্দোলনের মূল দাবি ছিল দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকায় উন্নীত করা। আন্দোলন শুরুর সময় এই মজুরি হার ছিল দৈনিক ১২০ টাকা। শ্রমিকদের বক্তব্য ছিল এই মজুরিতে বর্তমান বাজারে তাদের সংসার চলছে না আর। বিশেষ করে ২০২২ সালে জিনিসপত্রের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিক পরিবারগুলোকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে সমস্যা হচ্ছে।

মূলত চা খাতের 'চা শ্রমিক ইউনিয়ন' ছিল এই আন্দোলনের সংগঠক। তবে দেশব্যাপী নাগরিক সমাজের অনেক সংগঠক এবং লেখক-বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনের সমর্থনে ইতিবাচক অবস্থান নিয়েছিলেন এবার। ২২ আগস্ট দেশের ৪৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক শ্রমিকদের মজুর বাড়ানোর দাবি সমর্থন করে এক বিবৃতি দেন– যা জাতীয় পত্রপত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ঐ বিবৃতিতে বলা হয়, 'বর্তমানে গ্রামের একজন মজুরকে সারাদিনের জন্য মজুরি দিতে হয় কমপক্ষে ৪০০ থেকে ৬০০ টাকা। এ ছাড়া শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্নতম মজুরি বোর্ড বিভিন্ন সেক্টরের যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেছে, তা আরও বেশি।'

চা শ্রমিকদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও সমাবেশ হয়েছে আগস্টে।

মজুরি যেভাবে ১৭০ হলো

নিজস্ব পেশাগত দাবিতে চা বাগানগুলোতে শ্রমিকরা আলাদা আলাদা সভা-মিছিল করে আগস্ট জুড়ে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয়ভাবেও সিলেট ও মৌলভীবাজারে সভা সমাবেশ হয়েছিল। এক পর্যায়ে শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক চা খাতের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে ১৬ আগস্ট সিলেটে এক বৈঠক করেন। সেই বৈঠক ফলপ্রসূ না হওয়ায় ঢাকায় শ্রমিক, মালিক ও সরকারি প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে বসেন।

মালিকরা প্রাথমিকভাবে মাত্র ২০ টাকা মজুরি বাড়ানোর প্রস্তাব

দেয়। শ্রমিকরা সে প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে উদ্যোগী হন। ১৩ সদস্য বিশিষ্ট মালিকদের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তাঁর এক বৈঠক শেষে মজুরি ১৭০ টাকা নির্ধারিত হয় এবং শ্রমিকরা পুরোপুরি কাজে ফেরে।

৩ সেপ্টেম্বর চা শ্রমিকদের সঙ্গে এক ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী এও বলেছেন, তাঁর সরকার বাগানে শ্রমিকদের ঘর তুলে দেয়ার কর্মসূচি নিবে। ৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার কথা দেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

লাভের শিল্প খাতে শ্রমিকদের দারিদ্র্য

খাত হিসেবে চা উৎপাদন বাংলাদেশে অতি পুরাতন এক লাভজনক খাত। আগে চা ব্যবসা আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভরশীল থাকলেও এখন বিশাল এক দেশীয় বাজার তৈরি হয়েছে এই পণ্যের। চায়ের দেশজ চাহিদা এত বাড়ছে যে বাংলাদেশকে চা আমদানিও করতে হতে পারে ভবিষ্যতে।

দৈনিক বণিকবার্তার ২০২১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশীরা প্রতিদিন প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ কাপ চা পান করে। এই হিসাব চা বোর্ডের। বর্তমানে প্রতি কাপ চায়ের ন্যূনতম দাম ৫ টাকা। কোথাও কোথাও সেটা ১০ থেকে ২০ টাকায় কিংবা আরও বেশিতেও বিক্রি হয়। ৫ টাকা হিসেবে দৈনিক চা পান হয় প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকার। অর্থাৎ কেবল দেশের বাজারে ন্যূনপক্ষে প্রায় দুই হাজার ৪ কোটি টাকার বাজার রয়েছে চায়ের।

চা চাষের জমিগুলো মালিকদের ইজারা দিয়েছে সরকার। ১৫৮টি বড় বাগানের হাতে এরকম ইজারা দেয়া জমি আছে এক লাখ ১৩ হাজার হেক্টরের মতো। এ হিসাবও চা সংসদের। বাজারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইজারা জমির প্রায় অর্ধেকেই এখনও চা আবাদ হচ্ছে না। বরং অন্যান্য কৃষিপণ্যের আবাদ হচ্ছে। ফলে শ্রমিক চাহিদাও বাড়ছে না। যা পরোক্ষে মজুরি বাজার মালিকদের পক্ষে রাখে।

পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁয়ের বাগানগুলো বাদে বৃহত্তর সিলেট-চট্টগ্রামের বাগানগুলোতে কাজ করে প্রায় এক লাখ ৩৮ হাজার শ্রমিক। যাদের অর্ধেক নারী। এখানকার শ্রমিক পরিবারগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠই অবাঙালি। চট্টগ্রামের বাগানগুলোতে সম্প্রতি কেবল চা শ্রমিক হিসেবে বাঙালিদের অভিষেক ঘটছে।

অবাঙালি চা শ্রমিকদের মাঝে কয়েক ডজন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনমালে এদের বর্তমান ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজের সুযোগের কথা বলে সিলেট ও আসাম অঞ্চলে নিয়ে আসা হয়েছিল। একইভাবে তামিল নাড়ু থেকে শ্রী লঙ্কায় নেয়া হয় দরিদ্র তামিলদের। এরকম মানুষরাই আসাম, বাংলাদেশ ও শ্রী লঙ্কায় বন-জঙ্গল ও ঝোঁপঝাড় পরিষ্কার করে চা বাগান তৈরি করেছে। তাঁদেরই বর্তমান প্রজন্ম বাংলাদেশে এত এত দশক পর আন্দোলন শেষে এখনও দিনে ২ ডলারের কম মজুরিতে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ ২০২২ সালেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তারা দারিদ্র্য-চক্র থেকে বের হওয়ার কোন সুযোগ পাচ্ছে না।

বরাবরই চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি থেকে কেটে রাখা হয় প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, ধর্মীয় কাজের তহবিল ও ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য চাঁদা। তবে দৈনিক নগদ মজুরির সঙ্গে একজন শ্রমিক আরো যা পায়, তার মধ্যে অন্যতম সাত-আট কেজি চাল বা আটা (সাড়ে তিন কেজি নিজের জন্য এবং বাকিটুকু স্বামী/স্ত্রী ও ১২ বছরের কম বয়সী সন্তানদের জন্য)।

স্থায়ী বা নিবন্ধিত শ্রমিক হলে প্রতি বছর ৪৭ দিনের মজুরির সমান উৎসব ভাতা পায় শ্রমিকরা– যা দুটি প্রধান উৎসবে দেয়া হয়। এছাড়া লেবার লাইন বা শ্রমিক কলোনিতে বসবাসের জন্য ভাড়া দিতে হয় না। ওসব ঘর অবশ্য নিম্নমানের। চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা তারা যা পায় তাও নামমাত্র। নগদ মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা মিলিয়ে একজন শ্রমিকের বর্তমান মাসিক আয় ৬-৭ হাজার টাকার বেশি নয় বলে দাবি বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠকদের।

চামড়া শিল্প-নগরীতে দূষণ-সংকট কাটলো না

ঢাকার কেন্দ্রস্থল থেকে সাভারে স্থানান্তরের দীর্ঘ পরও চামড়া খাতে পরিবেশ দূষণজনিত সংকট কাটেনি। বরং ক্রমে পুরো সাভারের জল ও মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে চামড়া বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া।

ঢাকায় থাকার সময় এই শিল্পের বর্জ্য বুড়িগঙ্গা ও আশেপাশের এলাকাকে দূষণ করতো বলে স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল। সে কারণেই দীর্ঘ এক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে কারখানাগুলোকে সাভারের হেমায়েতপুরে ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে সরিয়ে নেয়া হয় ২০১৭ সালে।

কিন্তু বর্জ্য পরিশোধন বা বর্জ্য মানুষের ব্যবহারের জায়গাগুলো থেকে দূরে সরানোর নিরাপদ ও পূর্ণাঙ্গ কোন ব্যবস্থা না থাকায় নদীর পানির সূত্রে হেমায়েতপুরে এখন ঢাকার মতোই পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এমনকি দূষণ যাচ্ছে ধলেশ্বরীর মূল নদী যমুনা হয়ে আরও বহু দূর। যা পরোক্ষে চামড়া শিল্পের ইমেজ খারাপ করছে। খোদ পরিবেশ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে ২০২১ সালে যে আপত্তি তুলেছিল তারও কোন বাস্তবায়ন ঘটেনি ২০২২ সালেও।

চামড়া শিল্পের জন্য সাভারে দরকার পূর্ণাঙ্গ একটা কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার। শিল্পের ভাষায় যাকে বলা হয় 'সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিট্রমেন্ট প্লান্ট' বা সিইটিপি। সাভারে ১৫৫টি শিল্পপ্লটের প্রায় ১৩০টিতে কাজ চলা অবস্থায় কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারের কার্যক্রম খুবই জরুরি। কিন্তু সেটায় প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে সক্ষমতায় ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। কেন এমন ঘটলো– সে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কেউ নেই এখানে।

পরিবেশসম্মত ট্যানারি শিল্পনগরী গড়ে তোলার অংশ হিসেবে ২০১২ সালে চীনের একটি কোম্পানিকে ২৪ মাসের সময় দিয়ে সিইটিপি নির্মাণের কার্যাদেশ দেয়া হলেও দফায় দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২১ সালে সেই সিইটিপির কাজ শেষ হয়। যার সক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলে এখন ধরা পড়েছে। ফলে বর্জ্যের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, সিইটিপি দৈনিক প্রায় ২৫ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য শোধন করতে পারে। কিন্তু কোরবানির ঈদের পর পর ট্যানারিগুলো দৈনিক প্রায় ৫০ হাজার ঘনমিটার এবং স্বাভাবিক সময়ে ৩০ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য সৃষ্টি করে। ফলে পরিশোধন না করেই বর্জ্য নদীতে ফেলা হয়। এতে পরিবেশ দূষণ বাড়ছে প্রতিদিন। ডাম্পিং ইয়ার্ড বলতে কার্যকর এবং পূর্ণাঙ্গ কোনো অবকাঠামোই তৈরি করা হয়নি এখানে।

এ কাজের দায়িত্বটি ছিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার। সাভারে দূষণজনিত সমস্যা না মেটাতে পারলেও ২০২২ সালের ২৪ জুলাই বণিকবার্তার এক প্রতিবেদনে জানা যায় বিসিককে আরও একাধিক চামড়া শিল্প নগরী গড়ার দায়িত্ব দেয়া হতে পারে। খবর হিসেবে এটা উদ্বেগজনক ছিল। কারণ তাতে দূষণ ছড়ানো হবে আরও বহু জায়গায়। অথচ বাড়বে না এই খাতের আন্তর্জাতিক ইমেজ ও চাহিদা।

বাংলাদেশের শিল্পখাতে পুরানো একটা মুখস্থ অভিযোগ ছিল শ্রমিক অসন্তোষের কারণে শিল্পের বিকাশ ও বাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে না। কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল খাতের মতোই চামড়া খাতেও শ্রমিকদের তরফ থেকে গত কয়েক বছর ব্যাপকভিত্তিক সংগঠিত কোন আন্দোলন নেই। নানান সংকটে থাকলেও বাস্তব বিবিধ সমস্যায় শ্রমিকরা এখানে সংগঠিত হয়ে দাবি-দাওয়ার কথা তুলে ধরতে পারছে না। এ অবস্থাতেও সম্ভাবনাময় এই খাতে বাজারের সম্প্রসারণ ঘটেনি। ঘটাতে পারেননি মালিকরা। বাজার বড় না করতে পারার জন্য তাঁরা শ্রমিকদের দোষারপ করতে পারছেন না অতীতের মতো। কারণ বাজার সম্প্রসারিত না হওয়ার মূলে রয়েছে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কাজের পরিবেশ না থাকা এবং তার ফল হিসেবে লেদার ওয়াকিং গ্রুপের দরকারি সনদ না পাওয়া। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইউরোপ ও আমেরিকার বৃহৎ ক্রেতারা বাংলাদেশ থেকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য কিনছেন কম।

চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার তিনটি স্তর রয়েছে। এই তিন স্তরের শেষ স্তর ফিনিশড চামড়া থেকে তৈরি হয় চামড়াজাত নানা বাহারী পণ্য। এই তিন পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষা করা হলে পাওয়া যায় লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের সনদ। এই সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের চামড়া দিয়ে পণ্য তৈরির শর্ত দিয়ে দেয় পৃথিবীর বড় বড় ব্র্যান্ডের কোম্পানিগুলো। বাংলাদেশে কয়েক শ ট্যানারি থাকলেও তিন পর্যায়ে সনদ রয়েছে কেবল চট্টগ্রামে একটি প্রতিষ্ঠানের। সে কারণে ওই প্রতিষ্ঠানটির বাইরে দেশের অন্য

কেউ বিশ্বের নামকরা কোম্পানির পণ্য তৈরি করতে চাইলে তাকে নির্ভর করতে হয় সনদপ্রাপ্ত কম্পানির আমদানি করা চামড়ার উপর।

এরকম বাস্তবতায় চামড়া পণ্যের বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা আগের মতোই– প্রায় ২ শতাংশে আটকে আছে। অথচ এই খাত, বিশেষ করে চামড়া পণ্যের রফতানিতে বড় সুবিধা ছিল– কাঁচামালের প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা ছিল স্থানীয়ভাবে। অর্থাৎ এই খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা হিসেবে যা আসতো সেটার পুরোটাই দেশের হতো।

কিন্তু এখন কেবল যে বাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে না তাই নয়– ঢাকাকেন্দ্রীক চামড়া শিল্পের বয়স প্রায় ৮০ বছর হতে চললেও এখাতে প্রত্যাশিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাও গড়তে পারেননি মালিকরা। একই সময়ে ইতালিসহ চামড়াপণ্য উৎপাদক অনেক দেশে বর্জ্য রিসাইকেল করার প্রযুক্তি বসে গেছে এবং তাতে বিশ্ববাজারে তারা কর্তৃত্ব করছে।

উল্লেখ্য, টাঙ্গাইলের সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী রণদাপ্রসাদ সাহার হাত ধরে গত শতাব্দীর ৪০ সালের দিকে নারায়ণগঞ্জে এই অঞ্চলের প্রথম ট্যানারি স্থাপিত হয়। যা পরে সরিয়ে আনা হয় ঢাকার হাজারিবাগে বুড়িগঙ্গার পাড়ে। পাকিস্তান আমলে অবাঙালি কিছু ব্যবসায়ীর হাত ধরে সেই এলাকায় বিস্তার লাভ করেছিল এই শিল্প। স্বাধীনতার পর যা আসে বাঙালিদের হাতে। তবে দেশের এই শিল্পের বিরুদ্ধে দূষণের অভিযোগ ছিল আগে থেকেই। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ১৪টি খাতের ৯০৩টি শিল্প কারখানার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূষণকারী হিসাবে হাজারিবাগের সব ট্যানারিকে বিপদজনক তালিকাভূক্ত।

এরপর আট বছর ধরে এই দূষণ বন্ধে নানা চেষ্টা তদবির চলে। সেসব চেষ্টা সফল না হওয়ায় ১৯৯৪ সালে এ বিষয়ে আদালতে রিট দায়ের করে পরিবেশবাদী সংগঠন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)। ওই রিটের রায় হয় ২০০১ সালের ১৫ মে। রায়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রথমে ছয় সপ্তাহ সময় দেয়া হয়। আট বছরেও সেই নির্দেশনা বাস্তবায়ন না হওয়ায় ২০০৯ সালে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ। আদালত অবমাননার আদেশের পরও তেমন একটা কাজ হয়নি। বরং চলতে থাকে দূষণ।

অবশেষে আরো আট বছর পর ২০১৭ সালে হাইকোর্টের আদেশের পর বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়া হলে মালিকরা ট্যানারি সরিয়ে আনে সাভারের ট্যানারি শিল্প নগরীতে। আর এভাবেই ঢাকার বিপদ স্থানান্তরিত হয় সাভারে।

ট্যানারি থেকে মূলত দুই ধরনের বর্জ্য উৎপাদিত হয়। তরল বর্জ্য এবং কঠিন বর্জ্য। তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ট্যানারি শিল্প নগরীতে বহু বিলম্বে অপ্রতুল সামর্থ্য নিয়ে সেন্ট্রাল এফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্যান্ট বা সিইটিপি স্থাপন করা হলেও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন পদ্ধতি নেই। সে সংকটের কথা স্বীকার করলেও ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহিন আহামেদ মনে করেন, সিইটিপি এখন ঠিকঠাকমতোই চলছে (ডয়েস ভেলে, ৮ জুলাই ২০২২)। অথচ বাস্তবে যেয়ে দেখা যায়, সিইটিপির সীমানা প্রাচীরের বাইরে নদী তীরে গড়ে উঠেছে বিশাল ময়লার ভাগাড়, যেখানে কঠিন বর্জ্য ফেলছে ট্যানারিগুলো।

ডয়েস ভেলে উপরোক্ত তারিখে তাদের সরেজমিন এক প্রতিবেদনে লিখেছে ট্যানারি শিল্প নগরীর পেছনের দিকে অনেকগুলো ড্রেন ও পাইপ রয়েছে, যেগুলো দিয়ে তরল বর্জ্য নির্গমন হচ্ছে। ভরা বর্ষায়ও পাইপের সামনে নদীর পানি কালো হয়ে গেছে।

অন্যদিকে যেখানে কঠিন বর্জ্য ফেলা হয়, সেখান থেকে কখনো উপচে, কখনো বৃষ্টির পানিতে ভেসে এ সব বর্জ্য নদীতে মিশছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

চামড়া শিল্প নগরীর উল্টোপাশে নদীর অপর পাড়ের গ্রাম মিল্কিহাটি এলাকার ইউপি সদস্য জালাল মেম্বার ডয়চে ভেলেকে বলেন, তার এলাকার শত শত মানুষ এই নদীতে মাছ ধরতো। কয়েক বছর আগেও রাতভর মাছ ধরলেই দুই তিন হাজার টাকার মাছ পেতেন তারা। তিনি নিজেও ধরতেন।

সারা বছর এই মাছ পাওয়া যেত উল্লেখ করে তিনি বলেন, কৃষি কাজসহ অন্য পেশায় জড়িত স্থানীয়রাও খাওয়ার জন্য বা মূল পেশার ফাঁকে ফাঁকে বাজারে বিক্রির জন্য মাছ ধরতো। দূর দূরান্ত থেকে পেশাদার শত শত জেলেও আসতো এই এলাকায়। ট্যানারি আসার পর মাছ হারিয়ে যাওয়ায় দূরের সেই জেলেরা বিদায় নিয়েছে। পাশাপাশি এলাকার মানুষ বেকার হয়েছে।

দেশের প্রধান চামড়া নগরী ও তার আশেপাশের এই করুণ হালের মাঝে কোরবাণীর ঈদের সময় চামড়ার প্রত্যাশিত দর না পাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন গরু-খাসি কোরবাণীদাতারা। দেশে বিগত বছর সব জিনিসের দাম বাড়লেও কেবল চামড়ার দর ছিল পড়তির দিকে। উল্লেখ্য, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর, চাহিদা, সরবরাহ, রপ্তানির সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে লবনযুক্ত প্রতি বর্গ ফুট গরুর চামড়া ঢাকায় ৪৭-৫২ টাকা, ঢাকার বাইরে ৪০-৪৪ টাকা, খাসীর চামড়া সর্বত্র ১৮-২০ টাকা এবং বকরির চামড়া সর্বত্র ১২-১৪ টাকা ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০২২-এ। বিক্রেতাদের মতে এই দরে ব্যবসায়ীদের আকাঙ্ক্ষারই প্রভাব পড়েছে। ব্যবসায়ীদের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে গত আট বছর ধরে ক্রমাগত চামড়ার দর কমানো হয়েছে। তারপরও চামড়া শিল্পের প্রত্যাশিত উন্নয়ন না হওয়া বিস্ময়কর। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের নির্দেশে চামড়া ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলো ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার দাম নির্ধারণ করে ৭০-৭৫ টাকা। ঢাকার বাইরে দর ছিল ৬০-৬৫ টাকা।

বাজেট তৈরির প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর চেষ্টা

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের বিদ্যমান কাঠামো ও প্রক্রিয়া অত্যন্ত কেন্দ্রিভূত। এই প্রক্রিয়ায় জনগণের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের অভাব রয়েছে। এমনকি সাংবিধানিকভাবে বাজেট অনুমোদনের জন্য নিযুক্ত সংসদ সদস্যদের (এমপি) সংসদে বাজেটকে প্রভাবিত করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

এ অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন এবং সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি যৌথভাবে এশিয়া ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, পেশা ও বৈশিষ্ট্যের মানুষের অংশগ্রহণে জনবাজেট আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টায় রয়েছে। যার উদ্দেশ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শ্রম ও কর্মসংস্থান, নারী, দলিত, প্রতিবন্ধী, উপজাতি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন বাজেটসহ জাতীয় পরিকল্পনা এবং বাজেট বিকেন্দ্রীকরণ কাঠামোতে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

এই আয়োজনে ২০২২ সালে ২০০ জন অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ এ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে তাদের ইস্যু সম্পর্কিত দাবি পেশ করেছে। জনগণের দাবি পূরণের জন্য আয়োজিত এই 'জন বাজেট সংসদ ২০২২' আন্দোলন নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার একটা চমৎকার কৌশল ছিল।

নীতিনির্ধারকগণ আন্দোলনকারীদের আশ্বাস দেন যে তারা বাজেটে জনঅংশগ্রহণ, বিকেন্দ্রীকরনের এই প্রচারণার সাথে আছেন। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিনেট হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মো: তাজুল ইসলাম, এমপি, মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ড. শামসুল আলম প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি এবং রুমিন ফারহানা, এমপি সহ ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের নাগরিক সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পাটকল খাতে শ্রমিকদের সভা-সমাবেশ-মিছিল

২০২০ সালে যেসব রাষ্ট্রীয় পাটকল বন্ধ হয়েছিল তার শ্রমিকদের একাংশ ২০২২ সালে বকেয়া পাওনার দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিল। তাদের আরেকটি দাবি ছিল বন্ধ পাটকল খুলে দেয়া। একই সময়ে দেশের অর্থনীতিবিদ ও শিল্প বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সভা সেমিনার থেকেও এরকম দাবি তুলেছেন। ২১ মে ঢাকায় 'দেশের মৌলিক শিল্প রক্ষায় বন্ধ পাট ও চিনিকল চালু ও তার বিকাশে প্রস্তাব' শীর্ষক এক সেমিনার হয়। সেমিনারের আয়োজন করে পাটকল-চিনিকল রক্ষায় শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা ঐক্য। অন্যদিকে, এবছর নতুন করে এখাতে বেসরকারি পাটকলগুলোর শ্রমিকদের আন্দোলন-সংগ্রামও যুক্ত হয়।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে দেশে ২৬টি সরকারি পাটকল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বন্ধের কারণ হিসেবে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)কে উদ্বৃত করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম তখন বলেছিল অব্যবস্থাপনা, সময়মতো পাট কেনায় টাকা ছাড় না দেওয়া, পুরোনো যন্ত্রপাতি, মাথাভারী প্রশাসন, নিম্নমানের পাট, ক্রয়-বিক্রয়ে দুর্নীতি, কাঁচা পাটের অভাব, ইউনিয়নের দৌরাত্ম এবং মিছিল-মিটিং ও আন্দোলন-সংগ্রামের কথা। ২১ মে'র সেমিনারে শ্রমিক নেতা রাজেকুজ্জামান বলেন, ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে পাটকল আধুনিকায়ন করা যেত, কিন্তু তা করা হয়নি। অথচ পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিয়ে মিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বন্ধ ৫টি মিলের কয়েক হাজার শ্রমিক ২০২২ এর ৫ জুলাই তাদের বকেয়া পাওয়ার দাবিতে ঢাকায় এসে বিজিএমসি কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেছে। উক্ত বিক্ষোভ-সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাটকল রক্ষায় শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা ঐক্যের সমন্বয়ক শ্রমিক নেতা রুহুল আমিন। সঞ্চালনা করেন খালিশপুর জুটমিল কারখানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির, আমিন জুটমিলের শ্রমিক নেতা মো. হানিফ ও পাটকল রক্ষায় শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা ঐক্যে'র অন্যতম নেতা সত্যজিৎ বিশ্বাস। উল্লেখ্য, সরকার পাটকল বন্ধের সময় ২ মাসের মধ্যে শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করে ৩ মাসের মধ্যে পুনরায় পাটকল চালুর ঘোষণা দিয়েছিল।

অন্যদিকে, বছরের শেষদিকে খুলনায় ৬ দফা দাবিতে বেসরকারি পাটকল শ্রমিকরা ভুখা মিছিল ও অনশন কর্মসূচি পালন করেছে। ১৩ নভেম্বর, রবিবার নগরীর ফেরিঘাট মোড় থেকে তারা থালাবাসন হাতে ভুখা মিছিল নিয়ে খুলনার ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে এসে অনশন কর্মসূচি পালন করে। পরে শ্রমিক ফেডারেশনের মহানগরের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান শ্রমিকদের শরবত পান করিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। শ্রমিকরা জানান, খুলনার আটরা ও মীরেরডাঙ্গা শিল্পাঞ্চলের বন্ধ বেসরকারি মহসেন, সোনালী, এ্যাজাক্স, আফিল, জুট স্পিনার্স ও হুগলী বিস্কুট কোম্পানির শ্রমিক-কর্মচারীদের যাবতীয় পাওনা এককালীন পরিশোধসহ ৬ দফা দাবিতে পূর্বঘোষিত এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিসিক শিল্পনগরীগুলো শ্রমিক-বান্ধব হয়ে উঠেনি

'বিসিক' শব্দটি বাংলাদেশের শিল্পায়নের ইতিহাসে খুব পরিচিত। বিসিক বলতে বোঝায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প সংস্থা। এই প্রতিষ্ঠান গড়ায় রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে অবকাঠামো গড়া ও তার ব্যবস্থাপনা দেখা। প্রায় ৬৫ বছর হয়েছে এই সংস্থার।

শুরুতে ধারণা করা হয়েছিল ঋণ দেয়ার মাধ্যমে বাংলার ক্ষুদ্র শিল্প গড়ার কাজটিকে সহায়তা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সেই সূত্রে ১৯৫৭ সালে ঋণের মাধ্যমে বিসিকের কাজ শুরু হয়। ১৯৬০-এর দশক থেকে বিসিক ঋণের পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল গড়ার কাজে নামে। তখনকার ১৮ জেলার সব কয়টিতে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। পুরানো সেসব জেলা ভেঙ্গে ইতোমধ্যে অনেক জেলা হয়েছে দেশে। তবে বর্তমানে প্রতি জেলা শহরেই বিসিকের কার্যালয় ও কাজ আছে। ৭০-এর অধিক 'শিল্পনগরী' আছে তার অধীনে। তার অধীনে প্রায় ১০ হাজার শিল্প প্লট রয়েছে। অনেকগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও গড়েছে তারা। বিসিক কিছু কিছু পণ্যও উৎপাদন করে থাকে। তবে স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিসিক প্রকৃতই কি শিল্পখাতে প্রত্যাশিত অবদান রাখতে পেরেছে? বিশেষ করে বিসিকের অধীনস্থ শিল্পাঞ্চলগুলোতে শ্রমিকদের জীবনমানের অবস্থা ও তাদের অধিকারের বাস্তবায়ন আশানুরূপ নয়। এছাড়া বিসিকের শিল্প-পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিসিক দাবি করে থাকে এ পর্যন্ত ৯ হাজারের অধিক শিল্পপ্লট বরাদ্দ দিয়েছে তারা। তাতে অন্তত পাঁচ হাজারের অধিক শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা। বিসিকের অধীনে সাম্প্রতিক বহুল আলোচিত দুটি উদ্যোগ হলো সাভারে ট্যানারি এবং মুন্সিগঞ্জে ওষুধ শিল্পের কাঁচামালের জন্য শিল্পাঞ্চল গড়া। কিন্তু এতসব শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকরা কীভাবে আছে? সাভারে বিশাল ট্যানারি শিল্পাঞ্চল গড়া হলো অথচ সেখানে শ্রমিকরা কোথায় থাকবে, তাদের সন্তানরা কোথায় পড়বে– এমন মৌলিক প্রশ্নের কোন উত্তর নেই এই শিল্পাঞ্চল পরিকল্পনায়।

এছাড়া ২০২২ সালের ২ নভেম্বর ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে শিল্প বর্জ্য অপসারণ বা পরিশোধনের জরুরি ব্যবস্থা খুব দুর্বল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত। উক্ত প্রতিবেদনে বিশেষভাবে নরসিংদী বিসিক শিল্পাঞ্চলের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, ১৯৮৬ সালে প্রায় ১৫ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্পনগরীটিতে রাস্তাঘাটের করুণ হাল। পুরো এলাকাটিতে সীমানা প্রাচীরের সংকট রয়েছে। প্রয়োজনীয় বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা না থাকায় এই শিল্পাঞ্চলের পাশের নদীটি ব্যাপকভাবে দূষণের শিকার শিল্প বর্জ্যে। ৯৫টি শিল্পপ্লট থাকলেও এখানে কার্যত চালু আছে মাত্র ২৪টি। বিসিক সচরাচর ৯৯ বছরের লিজ ভিত্তিতে এসব প্লট নতুন উদ্যোক্তাদের শিল্প গড়ার জন্য দিয়ে থাকে। নরসিংদি এই শিল্পনগরীতে প্রায় ৬ হাজার মতো মানুষের কাজের সুযোগ হয়েছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু তাদের অধিকাংশের মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা মালিকদের দয়া ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়টি দেখার এখানে কেউ নেই। একই অবস্থা দেখা যায় বাগেরহাটেও। ২০২২-এর ১৮ অক্টোবর প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে এখানকার বিসিক শিল্পনগরীর অবস্থা। ২১ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এই শিল্পাঞ্চলে পানির সংকট এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই। সড়কগুলোতে চলা দায়। প্লট সংখ্যা ১২৩ হলেও এখানে কারখানামতো প্রতিষ্ঠান আছে ৩৭টি। এই শিল্পাঞ্চলে শুরুতে নারিকেলের তেলমিল ছিল অনেক। পরে অন্যান্য শিল্পও এসেছে। তবে শ্রমিকদের পরিবার নিয়ে বসবাসের সুবিধার কথা ভাবা হয়নি আদি পরিকল্পনায়।

এ বিষয়ে বেশ কয়েক বছর আগে (১০.০১.২০১৭) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)-এর তখনকার চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহ. ইফতিখার বার্তা সংস্থা ডয়চে ভেলেকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা এরকম: 'শিল্প নগরীতে যে প্লটগুলো আছে সেখানে কেউ কিছু করতে চাইলে আমাদের কাছে অনুমোদন চায়। আমরা তখন তাঁদের কীভাবে ভবন হবে, পানির লাইন বা সুয়ারেজ লাইন কী হবে সেটা বলে দেই। কিন্তু শ্রমিকরা কীভাবে কাজ করবে সেটা দেখভাল করার কাজটি আমাদের কাজের আওতায় পড়ে না।' এদিকে ২০২২ সালের ৫ নভেম্বর বিসিক বিষয়ে প্রকাশিত এক মতামত জরিপে দেখা যায় ২০ শতাংশ উদ্যোক্তাই এখানকার সেবায় অসন্তুষ্ট। এই গবেষণায় আরও জানা যায়–

বিসিকের ১৫ শতাংশ শিল্পকারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে জামদানি শিল্পনগরীর কোনো কারখানাতেই অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এ ছাড়া প্রায় ৪৩ শতাংশ উদ্যোক্তা গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানিসহ বিসিকের বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে তাঁদের অসুবিধার কথা জানিয়েছেন। গবেষণায় উঠে এসেছে, অন্তত ১২টি বিসিক শিল্পনগরীতে দীর্ঘদিন ধরে পানি সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। বিসিকের প্রায় ৫০ শতাংশ কারখানায় গ্যাস-সংযোগ নেই বলেও গবেষণায় উঠে এসেছে। এর মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরের শিল্পনগরীগুলো সবচেয়ে বেশি গ্যাস-সংকটে ভুগছে। তবে আশ্চার্যজনকভাবে বিসিকের এই জরিপেও শ্রমিক সংক্রান্ত কোন তথ্য উপাত্ত নেই। এই জরিপের পরিসর অনেক বড় হলেও বিস্ময়করভাবে তাতে বিসিক সংশ্লিষ্ট শ্রমিক প্রসঙ্গ নেই। বিসিক তার এরকম তৎপরতা ও দৃষ্টিভঙ্গী সংশোধন করে নিজস্ব প্রতিটি শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের জীবন-মান উন্নয়ন বিষয়েও এখন থেকে ভাববে– এমনি আশা করে দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো। এছাড়া শিল্প নগরীর পরিবেশ দূষণ থেকে আশেপাশের পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়েও তাদের বাড়তি মনযোগ প্রয়োজন।

করোনা পরবর্তি ট্রমা কাটাতে ১৩৫ জন শ্রমিককে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের অন্যতম প্রধান উৎস পোশাক শিল্প। তা সত্ত্বেও এখানে কর্মরত শ্রমিকরা সর্বদা তাদের আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক কিছু জরীপে দেখা গেছে কোভিড ১৯ ও এর পরবর্তী সময়ে শ্রমজীবীরা বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা এক ধরনের ট্রমার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে ও তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সাইকোসোশাল কাউন্সিলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এসঅ-ারএস শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে তাদের আইনগত অধিকার, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকার ঢাকা-উদ্যান ও হেমায়েতপুর ওমেন ক্যাফেতে শ্রমিকদের জন্য লিগ্যাল ও কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং নারী গার্মেন্টস ও ট্যানারি কর্মীদের জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ২০২২ সালে ১৩৫ জনকে কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হয়। তাদের সাথে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং প্রাসঙ্গিক আইন এবং মানসিক অসুস্থতার প্রতিকার, ব্যক্তিগত এবং পেশাগত চাপ মোকাবেলায় কি করা উচিত এ বিষয়ে আলোচনা করা হয় সেশনে। ২০২২ সালে ওমেন ক্যাফেতে মোট ৫০ জনকে লিগ্যাল ও ৮৫ জনকে সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। লিগ্যাল কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে একজনকে মাতৃত্বকালীন সুবিধা বাবদ ৮৫,০০০ টাকা এবং অন্য ১ জনকে সার্ভিস বেনিফিট বাবদ ৬৪,০০০ টাকা পেতে সহায়তা করা হয়েছে। এছাড়া ৫ জন শ্রমিকের বিনা কারণে চাকরি চলে যাওয়ার পর এসআরএস এর পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেও-য়ায় পুনরায় তারা চাকরি ফিরে পেয়েছে । ২ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে আহত হওয়ায় চিকিৎসা খরচ বাবদ আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বাংলাদেশের সামনে দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ হাজির করছে

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ঢেউ লেগেছে বাংলাদেশেও। প্রথম তিন শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশ যতটুকু এগিয়েছে সে অর্জনে বড় ভূমিকা ছিল শ্রমজীবীদের। কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বাংলাদেশের মতো শ্রমজীবীপ্রধান দেশগুলোতে আসছে সম্পূর্ণ নতুন এক বাস্তবতা নিয়ে। চ্যালেঞ্জে পড়তে চলেছে পূর্বের তিন বিপ্লবের মুখ্য চরিত্র।

আমরা জানি, প্রথম শিল্পবিপ্লব ছিলো বাষ্পীয় ইঞ্জিন ভিত্তিক, দ্বিতীয় বিপ্লব এনেছিল বিদ্যুত এবং বিংশ শতাব্দির তৃতীয় বিপ্লব ছিল ইন্টারনেট ও কম্পিউটারকে ঘিরে। আর একবিংশ শতাব্দিতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ঘটছে ইন্টারনেটের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা সংযোগের মাধ্যমে। এতে শিল্পের অনেক কাজ করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্র। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে এযুগের যন্ত্রপাতিকে মানুষের চেয়েও চটপটে করে তোলা যাচ্ছে।

বর্তমানে উন্নত বিশ্বে সমাজে প্রাত্যহিক কাজে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার পরিসর বাড়াচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মেশিন। আবার এক মেশিনের বার্তা অন্য মেশিন বুঝে নিতে পারছে। জীবন্ত যোগাযোগ গড়ে উঠছে মেশিনের সঙ্গে মেশিনের। ফলে কর্মজগতের আগের পুরানো ভূমিকার কিছু কিছু জায়গায় মানুষ-কর্মীদের আর লাগবে না। যেমন, অনেক বড় অফিসেই এখন কে কখন আসছে-যাচ্ছে সেটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সেন্সর যন্ত্র দ্বারা মনিটর করা হয়। এরকম কাজ তদারকির জন্য কোন মানুষের আর দরকার হয় না। ব্যাংকগুলোতে টাকা গোনার জন্য অন্তত কাউকে আর লাগছে না। এটা আমাদের দেশের আনাচে কানাচেও হয়েছে। গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্টের তথ্যাদি জানিয়ে দেয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে এখন আর নিয়োগ দিতে হয় না। গ্রাহকই যন্ত্রের সাহায্যে সেটা জানতে পারেন। বেশ অনেক বছর হলো ক্যাপিটাল মার্কেটে শুরু হয়ে গেছে মধ্যবর্তী ব্যক্তির সহায়তাহীন ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা। কর্মজগতে এরকম-সব পরিবর্তনের জন্য এটাকে তাই অটোমেশনের যুগও বলা যায়। বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য ও শিল্প জগতে মালিকরা ইতোমধ্যে দ্রুতলয়ে নতুন প্রযুক্তি বসিয়ে তাদের স্থায়ী জনবলের তালিকা ছোট করে আনছে।

তবে নতুন এ যুগ যে কেবল লাখ লাখ মানুষের পুরানো ধাঁচের কাজ হারানোর শঙ্কা তৈরি করছে তা নয়। এই শিল্প যুগে তথ্য বা ডেইটা বিশ্লেষণের জন্য প্রচুর জনবলও লাগবে। আরও নানান ধরনের কাজের নতুন ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে কর্মজগতে প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদনশীলতা ও সমৃদ্ধি বাড়ায়। একসময় বাংলাদেশের সংবাদপত্র শিল্প কমপিউটার প্রযুক্তি গ্রহণে ইতস্তত ছিল মুদ্রণ কর্মীদের কাজ হারানোর ভয়ে। ইত্তেফাকে কমপিউটার প্রচলন থামাতে মুদ্রণকর্মীদের আন্দোলনের কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু পরে এই প্রযুক্তিই সংবাদপত্র শিল্পে বাড়তি অনেক কর্মীর চাহিদা তৈরি করে। তবে এটা সত্য, আসন্ন শিল্প যুগে পুরানো অনেক দক্ষতার চাহিদা থাকবে না। প্রয়োজন পড়বে নতুন অনেক দক্ষতার। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি কোন্ দেশ কীভাবে আত্মস্থ করছে তার উপরই সে দেশে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পরিণতি নির্ভর করছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে এমনও ধারণা করা হচ্ছে– কর্মজগতের এতদিনকার নিরানন্দময় কাজগুলোতে অটোমেশনের ফলে রোবট বসিয়ে সেগুলো থেকে মানুষের চিরস্থায়ী মুক্তি ঘটতে যাচ্ছে। এর ফলে প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে সমগ্র মানব সমাজ নতুন এক সভ্যতা গড়ার পথে এগোচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অধ্যায়ে। যে কারণে গণ-আতংকের চেয়ে আসন্ন এই বিপ্লবের জন্য দরকার গণ-প্রস্তুতি। কারণ বৈশ্বিক শ্রম বাজারে ইতোমধ্যে এক গণ-রূপান্তর অধ্যায় শুরু হয়ে গেছে। যেমন আমাদের দেশে শহুরে বাড়িঘর পাহারায় 'দারোয়ান'দের কাজটি মোটেই আনন্দদায়ক কিছু নয়। স্রেফ দেশে চাকুরির অভাব বলে মানুষ এই কাজ করছে অল্প বেতনে। এরকম কাজ অটোমেশনের মাধ্যমে হতে পারে এবং অদূর ভবিষ্যতে হবেও। গাড়ি চালানোর কাজ ইতোমধ্যে যন্ত্রের মাধ্যমে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে সভ্যতার এই নতুন প্রবণতাগুলো নিয়ে মুখরোচক কথাবার্তা হলেও তার জন্য প্রকৃতই প্রস্তুতিমূলক কাজ কী চলছে তা অস্পষ্ট।

বলা বাহুল্য, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগ সকল দেশের শ্রমজীবীদের জন্যই চ্যালেঞ্জ হিসেবে এসেছে। তবে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জটি দুই রকম। একদিকে দেশের ভেতরকার শ্রমজীবীদের নতুন এই শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা– দ্বিতীয়ত বিদেশে থাকা প্রবাসীদেরও প্রস্তুত করা। কারণ তারা কাজ হারালে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জায়গাও কমে আসবে। দেশে যেমন কর্মসংস্থান হারানো যাবে না তেমনি বিদেশেও বাংলাদেশীদের কাজের সুযোগ ধরে রাখতে হবে।

আমাদের দেশের মানুষের কাজের জন্য বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প ইতোমধ্যে প্রভাব রাখতে শুরু করেছে। জাপানে বৃদ্ধ মানুষের সেবায় ইতিমধ্যে কাজ করছে রোবটরা। অথচ একসময় অনুমান করা হতো, জাপানে প্রচুর নার্স দরকার হবে। বাংলাদেশের মতো অনেক দেশ সেখানে নার্সের বাজার নিয়ে আশাবাদী ছিল। বাংলাদেশের মতো মধ্য আয়ের অনেক দেশেই নির্মাণ খাত গুরুত্বপূর্ণ। রোবটিকস যেসব খাত নিয়ে সবচেয়ে বেশি স্বপ্ন দেখছে, তার একটি নির্মাণ খাত। এ খাতে অতি স্বল্প সময়ে অনেক বড় নির্মাণ সমাধা করবে আগামী দিনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

মুশকিল হলো বাংলাদেশে শ্রমজীবী সমাজ এখনও অবহিত নয় কী ধরনের কাজের জায়গা শিগগির প্রযুক্তি কেড়ে নিবে এবং নতুন কি ধরনের কাজের জায়গা প্রযুক্তি নতুন করে নিয়ে আসবে।

অথচ আসন্ন বিপ্লবের এই দুটি দিক সম্পর্কে আগাম জানা বিশ্বের বহু দেশের চেয়ে বাংলাদেশের জন্য বেশি জরুরি। আমাদের জনসংখ্যায় এমুহূর্তে কাজের যোগ্য লোক সংখ্যা (১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী) রয়েছে সর্বোচ্চ অবস্থায়– প্রায় ৬৬ শতাংশে। শিগগির এটা প্রায় ৭০ শতাংশে যাবে এবং তারপর হয়তো ধীরে ধীরে বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকবে।

কাজের-যোগ্য লোক বেশি থাকার মানে হলো একদিকে বিদ্যমান কর্মজীবীদের কাজ হারানোর ঝুঁকি কমাতে হবে– অন্যদিকে কাজ প্রত্যাশী জনবলকে অটোমেশন যুগের আদলে তৈরি করতে হবে। দ্য বিজনিস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা ২০২১ সালের ২৮ ডিসেম্বর এক প্রতিবেদনে 'এটুআই'-এর এক জরিপ উদ্বৃতি করে জানিয়েছিল আগামী এক দশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ঢেউয়ে বাংলাদেশে প্রায় ৫৫ লাখ কর্মজীবীকে বর্তমান পেশাচ্যুত হতে হবে। তবে একই সময় বাংলাদেশ চাইলে প্রায় এক কোটি লোকের জন্য নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করে নিতে পারে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পখাত পোশাক তৈরি শিল্পে এখনও অটোমেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ঢেউ বড় আকারে ওঠেনি। এর কারণ এখানে সস্তা শ্রমের আধিক্য। যেহেতু কম মজুরিতে প্রয়োজনীয় শ্রম পাওয়া যাচ্ছে সেকারণে মানুষের বদলে যন্ত্র-কর্মী বসানোতে মালিকদের এখনও মনযোগ কম। কিন্তু ক্রমে সে জায়গায় যেতে হবে তাদের কম সময়ে অধিক উৎপাদনশীলতার জন্য। পোশাক খাতে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি ভিয়েতনাম ইতোমধ্যে তাদের এই শিল্পকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী সাজাচ্ছে। বাংলাদেশকে সেরকম করতে হলে পোশাক তৈরি খাতের কর্মীদের নতুন করে প্রশিক্ষিত করে পুনর্বাসন করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার স্বার্থেই পণ্য উৎপাদনের সময় কমিয়ে আনতে হবে বাংলাদেশসহ সকল দেশকে। কেবল উৎপাদন সময়ের স্বার্থেই নয়– কোয়ালিটি কন্ট্রোলের জন্য অটোমেশন উদ্যোক্তাদের জন্য একটা ভালো বিকল্প। কারণ যন্ত্র মানুষের চেয়ে ভালোভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কেবল শিল্প নয়–কৃষিতেও নতুন শিল্প বিপ্লব এমনসব পরিবর্তন আনবে যা শ্রম উদ্বৃত্ত অবস্থা তৈরি করতে পারে বাংলাদেশে। ড্রোন দিয়ে সার ও কীটনাশক ছিটানো, সেন্সর প্রযুক্তি দিয়ে মাটি পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে কায়িক শ্রমের চাহিদা কমানো হতে পারে।

এই অবস্থায় বড় করণীয় হলো পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং বিশাল আয়তনের কারিগরী প্রশিক্ষণ অবকাঠামো গড়ে তোলা। যেহেতু প্রায় সকল ধরনের ব্যবসা ও শিল্প নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করছে সেকারণে স্থানীয় জনশক্তিকে আসন্ন প্রযুক্তিনির্ভর কর্মজগতের সঙ্গে এখনি পরিচিত ও অভ্যস্ত করা দরকার। কৃষির খাতের জন্য এ করণীয় প্রযোজ্য। তৈরি পোশাকের মতো খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ানো শুরু হলে সেগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন নতুন একদল কর্মী লাগবে।

তবে বাংলাদেশের জন্য সমস্যার দিক হলো এখানে উচ্চশিক্ষা স্তরে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত কিছু বিভাগ ছাড়া আসন্ন শিল্প বিপ্লবকে কেন্দ্রে রেখে পাঠ্যসূচি তৈরির আয়োজন খুব কম। বিশেষ করে স্কুল কলেজ পর্যায়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আলোকে ব্যাপক ধাঁচে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও পাঠ-অভ্যাস পাল্টানো এখনি জরুরি। এটা না করার ফলে বাংলাদেশে এমনও স্ববিরোধী অবস্থা হতে পারে– একদিকে কর্মজগত প্রয়োজনীয় লোক খুঁজে বেড়াবে– আর বাইরে প্রচুর অদক্ষ বেকার কাজ খুঁজে ফিরবে। যার কিছু লক্ষণ ইতোমধ্যে স্পষ্ট। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন স্তরে স্বল্পমাত্রায় হলেও যেসব দক্ষ কর্মী তৈরি হচ্ছে তারাও বিপুল হারে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে সামাজিক বিভিন্ন কারণে। ফলে এখানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী জনবলের ঘাটতি থাকছেই।

জলবায়ু দুর্যোগে পেশাচ্যুত বিপুল শ্রমজীবী: পুনর্বাসন চাহিদা বাড়ছে

অঞ্চলগতভাবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম শিকার। সেটা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং নিয়মিত উল্লিখিত হয়। সাম্প্রতিক সৃষ্ট অতি খারাপ অবস্থার পাশাপাশি এখানে নিয়মিত যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটছে তার বড় এক শিকার স্থানীয় শ্রমজীবীরা। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মীরা। এরকম অনেকেই পুরানো পেশা এবং কর্মস্থল হারিয়ে বিভাগীয় শহরগুলোতে উদ্বাস্তু হচ্ছে। রাজধানীর বস্তিগুলোও উপচে পড়ছে এরকম মানুষদের ভারে। যার কারণে গ্রাম থেকে এখন শহরে দারিদ্র্য পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে খারাপ। বাংলাদেশে শ্রম পরিস্থিতির নতুন এক সংকট হয়ে উঠেছে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে নগর দারিদ্র্যের এই দুষ্ট যোগসূত্র।

স্মরণাতীতকাল থেকে বঙ্গে বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, নদী ভাঙন, জলাবদ্ধতা সমস্যা ছিল এদেশে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তার কিছু কিছু অতীতের চেয়ে বেশি বাড়ছে। বিশেষভাবে বাড়ছে মাটিতে লবণাক্ততা। অনিয়মিত বন্যা, বৃষ্টি ও নদী প্রবাহের কারণে নদী ভাঙ্গনও বাড়ছে। ফলে জমি ও সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে এবং বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে চলেছে। সরকার এসবকে মুখ্য প্রাকৃতিক বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিদেশীরাও এসব বিষয়ে সচেতন। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের প্রত্যাশিত মাত্রায় পুনর্বাসন হচ্ছে না।

সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের উপরোক্ত ধরনের প্রভাব মোকাবেলার কাজে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাত মিলে বছরে সামগ্রিক জাতীয় বরাদ্দের ৬ থেকে ৭ শতাংশ ব্যয় করে এখন। মুদ্রার হিসাবে এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ। কিন্তু এসব উদ্যোগের অগ্রাধিকার তালিকায় পৃথকভাবে শ্রমজীবীদের উল্লেখ নেই। ফলে শহরমুখী অভাবী মানুষের স্রোত থামানো যাচ্ছে না। তাদের পরিবারগুলোকে স্থায়ী কোন অর্থনৈতিক সমাধান দেয়া যাচ্ছে না। তাতে করে গ্রামীণ পরিসরের সমস্যা শহরে এসে জাতীয় সমস্যা হিসেবে স্থায়ী চেহারা নিচ্ছে।

বাংলাদেশে এখনও জীবিকা নির্বাহে বিপুল মানুষ কৃষি খাতের ওপর নির্ভরশীল। ২০২০ সালের এক হিসাবে দেখা গেছে দেশের মোট শ্রম খাতের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ কৃষিতে জড়িত।

বর্ষা মৌসুম শুরুর সময় এবং শুরুর আগে যে বৃষ্টিপাত হতো তার পরিমাণ কমে গেলেও আগাম বর্ষা, বিলম্বিত বর্ষা এবং মওসুমের শেষদিকে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে গেছে। এমনকি শীতেও বর্ষার মতো বৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে। ২০২২-এর অক্টোবরে শীতের শুরুতে ৩-৪ দিনের ঝড়বৃষ্টি হলো। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এভাবে বৃষ্টিপাতের সময় এবং পরিমাণে পরিবর্তন ঘটছে। এতে পানির সঞ্চয় এবং ব্যবহারও আগের মতো করা যাচ্ছে না। সামগ্রিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম। আবার উজানে ভারতকর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে উত্তরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে গেছে। ফলে খাদ্যশস্যের অন্যতম ভাণ্ডার উত্তরাঞ্চলের কৃষি চরম ঝুঁকিতে পড়েছে। কৃষিতে খরচ বাড়ছে। ফলে কৃষি কমছে। যার প্রতিক্রিয়ায় কৃষিতে কর্মসংস্থান কমছে। এতে করে গ্রামে যে উদ্বৃত্তি শ্রমশক্তি তৈরি হচ্ছে তারা টিকে থাকার জন্য নজর দিতে বাধ্য হচ্ছে শহরে বা দেশের বাইরে।

বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যে বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের প্রভাবে পদ্মা নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলোতে বসবাসরত মানুষের জীবনের ঝুঁকি বাড়বে। পদ্মা সমুদ্র পৃষ্ঠের চেয়ে এক মিটার নিচে অবস্থিত। পদ্মার তীরে বসবাসরত মানুষের প্রায় ৯০ ভাগের কাজ কৃষি, মাছ ধরা ইত্যাদি। এর মাঝে মৎস্যজীবী পরিবারগুলো ইতোমধ্যে বিপদে পড়ে গেছে। পেশা হারানোর পাশাপাশি তারা সুপেয় পানির সংকটে পড়েছে। এ বাস্তবতায় মৎস্য আহরণে জড়িতদের জীবনমান রক্ষায় তাদের বিকল্প পেশাগত প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন দরকার। এদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে উৎসাহিত করা যায় বা মাছ প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায় নিয়ে আসা যায়। তবে সেসবের জন্য প্রশিক্ষণ ছাড়াও সুদমুক্ত ঋণ, কারিগরি সহায়তা, জীবন বীমাসহ নানান প্রণোদনা দরকার। এসবে যত বিলম্ব হচ্ছে ততই এই মানুষরা ধীরে ধীরে ছুটছে অনিশ্চয়তা আর অজানার দিকে।

ঠিক এরকম বাস্তবতার মুখেই ২০২২ সালে শুরু হয় জিনিসপত্রের উচ্চ মূল্যস্ফীতি। বাংলাদেশের এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স ২০২২ এর ২৭ সেপ্টেম্বর। তাতে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শহরমুখী মানুষ ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ফাঁদে পড়ছে বেশি হারে। শহরে চলে আসার পর তাদের আর কোনো যাওয়ার জায়গা নেই। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং জীবনধারণের সকল খাতে খরচ বাড়ায় তাদের এখন দিশেহারা অবস্থা। অনেকেই বলেছেন, এভাবে বেঁচে থাকা যায় না।

রয়টার্স তাদের প্রতিবেদনে এরকম কিছু মানুষের বিবরণ দিয়েছে। যেমন, ঢাকার পশ্চিমে হেমায়েতপুরে একটি গার্মেন্ট কারখানায় কাজ করেন ৫০ বছর বয়সী আরজিনা বেগম। একটি স্যাঁতসেঁতে ছোট্ট রুমের ভাড়া বাসায় বসবাস করেন তিনি। বলেছেন, নিজেকে এবং তার ছেলের জন্য মাসে ১৫ হাজার টাকা বেতন পর্যাপ্ত নয়। তিনি বলেন, দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে এই বেতনে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই 'আয় বাড়াতে আমার ১৫ বছর বয়সী ছেলেকে একটা ওয়ার্কশপে যোগ দিতে হয়েছে।' এরকম অবস্থার বিষয়ে গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স রাইটস মুভমেন্টের নেত্রী তাসলিমা আখতার বিউটি বলেছেন, পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য এখন মাসে শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়ে ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা করা উচিত। এটা যে করা হবে- এমন কোনো ইঙ্গিত এখনো মিলছে না। এ অবস্থাতেই ২০২২ শেষ হলো।

আরজিনার বাসার কাছেই বসবাস করেন হযরত আলি নামে আরেকজন। তিনি মাসে আয় করেন ৯ হাজার টাকা। বলেছেন, এর ফলে তার পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমেই উদ্বেগ বাড়ছে। হযরত আলি বলেন, যদি মূল্য এভাবে বাড়তেই থাকে তবে এই মজুরিতে কোনমতেই মাস চলবে না। চাল, ডাল এবং তেলের মতো খাদ্যপণ্যের নিয়মিত রেশন প্রয়োজন।

রয়টার্স আরও লিখেছে, বর্ধিত মূল্যের ধাক্কা সাধারণ মানুষ কীভাবে ভোগ করছে সে বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই বোঝা লাঘব করার জন্য সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। ভর্তুকি মূল্যে জনগণের কাছে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রি করছে সরকার। কিন্তু যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে না ভর্তুকি। বিশ্লেষকরা বলছেন, বহু মানুষ এখন তাদের খরচ কমাচ্ছে খাওয়া কমিয়ে।

নিশ্চয়ই এরকম পরিস্থিতির চটজলদি পূর্ণ সমাধান নেই। তবে সমাধানের উদ্যোগগুলো এখনি শুরু করা দরকার। এরজন্য প্রয়োজন জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমজীবীদের গ্রাম-শহর দু'জায়গাতেই পেশাগত পুনর্বাসনে মনযোগ দেয়া। তাদের বিকল্প পেশার জন্য প্রশিক্ষণ, পুঁজি ও প্রয়োজনে বিপণন সহায়তা দেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। মধ্যবর্তী সময়ে তাদের দরকার বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। যে কর্মসূচির একমাত্র লক্ষ্য হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত কিংবা পেশাচ্যুত শ্রমজীবীদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা।

দেশে কম্পানি অনেক, কল্যাণ তহবিলে মুনাফার হিস্যা জমা হচ্ছে তিন শতের কম সংস্থার

২০২২-এর অক্টোবর পর্যন্ত দেশে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে মুনাফার হিস্যা জমা দেয়া কম্পানির সংখ্যা তিন শত অতিক্রম করেনি। অথচ দেশে আরও অনেক কম্পানি এরকম হিস্যা দেয়ার উপযুক্ত হবে ধারণা করা হচ্ছে। ১২ এপ্রিল দৈনিক নিউএজের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়– কেবল ঢাকা স্টক একচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কম্পানির সংখ্যা ৩৪৮টি। যার অন্তত আড়াই শ মুনাফায় রয়েছে। কিন্তু তাদের অনেকে শ্রমিক হিস্যা জমা দেয় না।

শ্রমিকরা চাইছে এসব কম্পানিকে তাদের মুনাফার হিস্যা আইন অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা দিতে অবিলম্বে বাধ্য করা হোক। একই সঙ্গে তহবিলে জমা হওয়া বিপুল অর্থ জমিয়ে না রেখে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দুর্দিনে শ্রমিকদের সেখান থেকে অনুদান দেয়ার পরিমাণ বাড়ানোও জরুরি। কারণ মহামারির কালে এবং মহামারির পর অর্থনৈতিক মন্দার মুখে শ্রমজীবীদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্তমান শ্রমআইন অনুযায়ী যেসব কম্পানির পেইড আপ ক্যাপিটাল এক কোটি টাকার বেশি তাদের নিট মুনাফার ৫ শতাংশের এক দশমাংশ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ ফান্ডে জমা দিতে হবে। অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকায় ৫০ পয়সা দিতে হয় এই তহবিলে। এই অর্থ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে শ্রম কল্যাণ ফাউন্ডেশন। ২০০৬ সাল থেকে এই তহবিলের কার্যক্রম শুরু হয়।

সময় টিভির ১৬ অক্টোবরের এক প্রতিবেদনে জানা যায় ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ২৯৩টি কম্পানি এই তহবিলে ৭৬৮ কোটি টাকা জমা করেছে। তবে এই জমায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, ইউনিলিভার, রবি, ওয়ালটন গ্রুপ এবং গ্রামীণ ফোনের মতো কিছু কম্পানির প্রদত্ত অর্থই বড় অংশ। যেমন বিটিসি ২০২২ সালে ১৫ কোটি ৭৩ লাখ টাকা দিয়েছে। ইউনিলিভার দিয়েছে ৮ কোটি টাকা। বিটিসি গত দশ বছরে সর্বমোট ৮৫ কোটি টাকা জমা করেছে এই তহবিলে।

২২ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত এই তহবিল থেকে ১৫ হাজার ২৩৭ জন শ্রমিককে প্রায় ৬৬ কোটি টাকা সহায়তা দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এর মাঝে ২০২২ সালে উপকারভোগীদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হাসেম ফুড দুর্ঘটনায় মৃত ৪৮ জনের পরিবার। তাঁদের ২ লাখ টাকা করে দেয়া হয়। এই ঘটনায় আহত ৩৮ জনকে ৫০ হাজার টাকা করে দেয়া হয়।

তবে দেশজুড়ে শ্রমিক সংখ্যা এবং তাদের বিপন্ন দশার বিপরীতে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানো দরকার বলে মনে করছেন শ্রমিকরা। নিয়ম অনুযায়ী তিন ধরনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের এই তহবিল থেকে অর্থ সহায়তার নিয়ম। এই তিন ক্যাটাগরি হলো শ্রমিকদের চিকিৎসা, শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা এবং কোন শ্রমিক মারা গেলে তার পরিবারকে সহায়তা দেয়া।

উল্লেখ্য, বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী কম্পানিগুলোকে মুনাফার ৫ ভাগের বাকি অংশ কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকদের 'ওয়ার্কার্স প্রফিট পারটিসিফেটরি ফান্ড' এ ৮০ ভাগ এবং সেখানকার শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ১০ ভাগ দেয়ার কথা। ২০২২ সালের বিভিন্ন মিডিয়া প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়– কম্পানিগুলো এক্ষেত্রেও ভয়াবহ গাফিলতির পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ২০২২ এর এপ্রিলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন বিভিন্ন কম্পানির কাছে তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছিল। তাতেই জাতীয় এই বাস্তবতা নজরে আসে সবার। অনেক কম্পানি এখনও কারখানা পর্যায়ে মুনাফায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কমিটিই করেনি। আবার সংশ্লিষ্ট অর্থ এমন কাজেও খরচ হচ্ছে যার সঙ্গে সরাসরি শ্রমিকদের কল্যাণের যোগ নেই। অথচ শ্রম আইনের বিধান হলো এই টাকা কেবল শ্রমিক কল্যাণেই খরচ করতে হবে। মুনাফার শ্রমিক হিস্যার টাকা শ্রমিকদের জন্য খরচ না করার অভিযোগ উঠেছে গ্রামীণ ফোনের মতো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও এবং বিষয়টির সত্যাসত্য আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।

এদিকে জয়েন্ট স্টক কম্পানি রেজিস্টারের দপ্তর থেকে দেখা যায় সেখানে সনদ নেয়া কম্পানির সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। এরকম অন্তত পাঁচ হাজার কম্পানি থেকে মুনাফার হিস্যা আদায়ের লক্ষ্য ছিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ভুক্ত শ্রমিক

কল্যাণ তহবিলের। এ বিষয়ে কলকারখানা পরিদর্শন বিভাগের সহায়তায় একটা তালিকাও করা হয় বলে জানা গেছে। কিন্তু কার্যত সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি এখনও। অথচ এসব কম্পানির ট্যাক্স ফাইল দাখিলের সময় যাচাই-বাছাই কালে মুনাফার শ্রমিক হিস্যার টাকা দেয়া হয়েছে কি না সেটা অনায়াসে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

এদিকে শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির বৈঠকের উপর তৈরি এক প্রতিবেদনে দৈনিক মানবকণ্ঠ ২০২২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি লিখেছে ঐ কমিটির সদস্যরা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের অর্থ কীভাবে জমা আছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। বিশেষ করে কমিটির সদস্যরা সমুদয় টাকা বেসরকারি ব্যাংকের বদলে সরকারি ব্যাংকে রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। প্রতিবেদনে লেখা হয়: 'সংসদীয় কমিটির বৈঠকের আলোচনায় কমিটির সদস্য মাদারীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য শাজাহান খান বলেন, শতকরা হারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারি ব্যাংকে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। এ সময় তিনি বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকে জমার হার কত সেটি জানতে চান এবং এই টাকা কোথায় কিভাবে আছে তাও জানাতে বলেন। এ সময় মন্ত্রণালয় জানায়, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলের ২৭৫ কোটি টাকা বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত (এফডিআর) হিসেবে রাখা আছে। আর বেসরকারি ব্যাংকে এফডিআর হিসেবে রাখা আছে ১৬৮ কোটি টাকা। এফডিআরের বাইরেও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হিসেবে বিভিন্ন ব্যাংকে জমা আছে ১৬৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা।'

উল্লেখ্য, শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের টাকা যখন এভাবে ব্যাংকে জমে আছে তখন কোটি কোটি শ্রমিক জানেও না তাদের কল্যাণে পাওয়া সম্ভব এসব অর্থের কথা এবং তা পাওয়ার পদ্ধতি। কারণ এই বিষয়ে জাতীয় পরিসরে কোন প্রচার প্রচারণা নেই।

প্রবাসী চাকুরিপ্রার্থীদের সংকটের আরেকদিক

পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত বহু মানুষ

[প্রথম আলোতে ২০২২-এর ২৭ নভেম্বর প্রতিবেদক নুরুল আমিনের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার]

পুলিশ সদর দপ্তরের হালনাগাদ তথ্য বলছে, গত ১৮ বছরে দেশে মানব পাচার প্রতিরোধ আইনে মামলা হয়েছে ৭ হাজার ৫১৭টি। নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ২৪৭টি, যা মোট মামলার মাত্র ৩ দশমিক ২৮ শতাংশ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ২০২১ সালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মানব পাচারসংক্রান্ত ৫৩৮টি মামলা তদন্ত করেছে। ওই বছরে মানব পাচার আইনের অধীনে করা মাত্র একটি মামলার রায় হয়েছে। ২০২২ সালে হয়েছে ১১টি মামলার রায়।

সাধারণভাবে কাজ নিয়ে বিদেশে যেতে ইচ্ছুক মানুষরাই এরকম অপরাধের শিকার হচ্ছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যানুযায়ী, সারা দেশে মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন ৩১ হাজার ১০১ জন। তাঁদের মধ্যে গত ১৮ বছরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ১৪ হাজার ৫৩৮ জন। এ সময় মানব পাচারকারী চক্রের সদস্যরা ১৩ হাজার ৪২৪ জনকে বিভিন্ন দেশে পাচার করেছেন। আর সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা উদ্ধার করেছে ১০ হাজার ৫৭৯ জনকে। মানব পাচারের মামলায় আটজনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে ২৯৯ জনের। অন্যান্য শাস্তি হয়েছে ১২৭ জনের।

মামলার তথ্য পর্যালোচনা করে পুলিশ সূত্র জানায়, মানব পাচার প্রতিরোধ আইনে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে ঢাকা বিভাগে। মোট মামলার ৪০ শতাংশ হয়েছে এ বিভাগে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ শতাংশ মামলা হয়েছে খুলনা বিভাগে। সবচেয়ে কম মাত্র ১ শতাংশ মামলা রংপুর বিভাগে।

বাংলাদেশ থেকে কোন কোন দেশে মানব পাচার বেশি হয়, তা-ও তুলে ধরা হয়েছে জাতিসংঘের অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইমের (ইউএনওডিসি) সাম্প্রতিক এক গবেষণায়। এতে বলা হয়, ভারত, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই, থাইল্যান্ড, ইতালি, গ্রিস, পর্তুগাল, সাইপ্রাস, স্পেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব, ওমান, কাতার, ইরাক, বাহরাইনে ও লিবিয়ায় বাংলাদেশিদের বেশি পাচার করা হয়।

ইউরোপে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে লিবিয়া, ইরাকসহ বিভিন্ন দেশে নিয়ে জিম্মি করা হচ্ছে মানুষকে। পরে নির্যাতনের ভিডিও পরিবারের কাছে পাঠিয়ে মুক্তিপণ আদায় করছেন মানব পাচারকারী চক্রের সদস্যরা। মুক্তিপণের টাকা না পেয়ে নির্যাতন করে মেরে ফেলাও হয়। মুক্তিপণের টাকা লেনদেনের সূত্র ধরে দেশে একাধিক মানব পাচারকারীকে শনাক্ত করেছে সিআইডি। তারা বলছে, অপহরণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশীদের কেউ কেউ।

অর্থনৈতিক মন্দার মুখে প্রবাসী শ্রমিকদের আয়ের গুরুত্ব বেড়েছে

২০২২ এর মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সংকট ব্যাপকতর হতে থাকে। এই সংকটের প্রধান দিক ছিল বৈদেশিক মুদ্রা হিসেবে ডলারের অভাব। ফলে বাংলাদেশকে আইএমএফ থেকে কঠোর শর্তে সাড়ে চার বিলিয়ন ঋণ করতে হয়। এসময় ডলার সংকটের কারণে আমদানিতে সংকটে পড়ে দেশ প্রথমবারের মতো প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার গুরুত্ব ভালো করে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সরকার এসময় নানান উদ্যোগ নেয়– যাতে প্রবাসীরা 'হুণ্ডি' বাদ দিয়ে ব্যাংকের বৈধ পথে তাদের উপার্জন দেশে নিকটজনের কাছে পাঠাতে উৎসাহিত হন। এ প্রেক্ষাপটে অনেকেই বলেছেন– প্রবাসীদের আয়ের বিপরীতে যদি বার্ধক্যকালীন কোন ভাতা দেয়া যেত তাহলে সরকারের আহ্বানে সাড়া বেশি পাওয়া যেত।

এ বিষয়ে প্রথম আলোতে ২০২২ সালে ১১ সেপ্টেম্বর একজন ব্যাংক কর্মকর্তা (মো.শরীফুল ইসলাম) নিজের অভিজ্ঞতা লিখেছেন:

প্রবাসীরা আর্থিক নিরাপত্তার প্রত্যাশী। সরকার যদি রেমিটারদের প্রেরিত অর্থের ওপর ভিত্তি করে পেনশন ভাতা/বিশেষ ভাতা চালু করে, তাহলে একজন রেমিটার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে হুন্ডিতে লেনদেন করবেন না। সরকার একটা কাঠামো দিয়ে দিতে পারে– যাতে একজন রেমিটার যত বেশি রেমিট্যান্স বৈধ পথে দেশে পাঠাবেন, তার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে তিনি দেশে এলে তত বেশি পেনশন ভাতা পাবেন। কত বছর পর্যন্ত এরকম রেমিট্যান্স আসতে হবে, পরিমাণ কী হবে এসবের শর্ত আলোচনা, অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ঠিক করা যেতে পারে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ সমন্বয়ে এরকম একটা রূপরেখা প্রণয়ন করা যায়।

তবে শরীফুল ইসলাম বা প্রবাসী শ্রমিকদের প্রত্যাশার সেরকম কোন প্রকল্প এখনও হয়নি। এছাড়া প্রবাসীদের অতীত অন্যান্য চাওয়ারও সামান্যই সমাধান হয়েছে এবছর। তবে মানুষের বিদেশগমন ভালোভাবেই অব্যাহত ছিল এ বছর। ৩০ জুন ২০২২-এ প্রকাশিত প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০২১-এর নভেম্বর থেকে পরের বছর প্রতি মাসে গড়ে এক লাখের বেশি বাংলাদেশী কাজ নিয়ে বাইরে গেছেন। স্বভাবত প্রবাসী আয় আসাও অব্যাহত ছিল পুরো দমে। অনেক দিন বন্ধ থাকার পর ২০২২ থেকে আবার মালয়েশিয়ায় শ্রমিক যাওয়া শুরু হয়। পাঁচ বছরে দেশটি বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫ লাখ কর্মী নিবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট আট লাখ কর্মীকে কাজের জন্য বিদেশে পাঠানোর লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে (ঢাকা ট্রিবিউন, ২২ আগস্ট ২০২২)। এরকম কর্মীদের যাওয়ার মাধ্যমে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। তবে হুন্ডিতে আয় পাঠানোর প্রবণতাও বাড়ছে বলে প্রথম আলোর উপরোক্ত প্রতিবেদনে প্রকাশ পায়।

উল্লেখ্য, বর্তমানে রেমিট্যান্স আহরণে বিশ্বে ১১তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বিদেশ থেকে একজন চাকুরিজীবী যেকোনো পরিমাণ আয় পাঠাতে পারেন দেশে। এর জন্য কোনো ধরনের কাগজপত্র লাগে না। এ ছাড়া প্রবাসী আয়ের ওপর দেশে আড়াই শতাংশ হারে প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। সেপ্টেম্বর থেকে প্রবাসী আয়ে প্রতি ডলারের জন্য ১০৮ টাকা দাম দিচ্ছিলো ব্যাংকগুলো। আগস্ট মাসে প্রবাসীরা প্রায় ২০৪ কোটি ডলারের আয় দেশে পাঠিয়েছিলেন। জুলাইয়ে প্রবাসী আয় এসেছিল প্রায় ২১০ কোটি ডলার। জুনে এসেছিল প্রায় ১৮৪ কোটি ডলার।

প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যু থামছে না

অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দেশে সরকার প্রবাসীদের আয় বৈধ পথে পাওয়ার বিষয় গুরুত্ব দিলেও প্রবাসীদের বিপন্ন দশার পুরানো কারণগুলো ২০২২ সালেও অব্যাহত ছিল। যার মধ্যে একটা– অশোভন কর্মপরিবেশের কারণে প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর ধারা ২০২২ সালেও অব্যাহত ছিল। এরকম শ্রমিকদের মৃত্যু বাড়লেও মৃতদেহ আসতে অনেক সময় লাগছে। যে বিলম্ব মৃতদের নিকটজনের জন্য এক শোকাবহ অবস্থা তৈরি করে। ঢাকা ট্রিবিউনে ১৮ আগস্ট (২০২২) প্রকাশিত এক খবরে দেখা যায় ব্রুনাইর একটি হাসপাতালে সাত মাস ধরে শিপন হালদার নামের একজন বাংলাদেশী প্রবাসীর লাশ পড়ে আছে।

দ্য বিজনিস স্ট্যান্ডার্ড-এর ২০২২ এর ৬ এপ্রিল প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, সর্বশেষ এক যুগে ৩৬ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিক লাশ হয়ে ফিরেছেন এবং এরকম মৃত্যুর হার বাড়ছে ক্রমাগত। গড়ে প্রতিবছর প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক বিদেশে মারা যাচ্ছেন। অতিগরম বা অতি ঠান্ডা আবহাওয়া, কাজের শোভন পরিবেশের ঘাটতি, অতিরিক্ত সময় কাজ করা, মানসিক চাপ ইত্যাদি মিলে এসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন 'রামরু'র গবেষক অধ্যাপক সি আর আবরার।

প্রবাস থেকে আসা মৃতদের প্রায় ৬০ ভাগ আসছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। এর মাঝে ৩০ ভাগই আসছে সৌদি আরব থেকে।

এরকম মৃত্যু কমাতে প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র হস্তক্ষেপ চেয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯ অক্টোবর ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে যেয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশ দেখতে চায়, আইএলও সারা বিশ্বে প্রবাসী শ্রমিকদের শ্রম অধিকার রক্ষায় আরও শক্ত অবস্থান নিয়েছে। প্রবাসী শ্রমিকরা আমাদের উন্নয়ন অংশীদার, তারাও মানুষ এবং তাদের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হয়, সেটিও দেখা উচিত।

অভিবাসন খাত নিয়ে কাজ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রবাসী কর্মীদের অস্বাভাবিক মৃত্যু তদন্তে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর প্রত্যাশিত উদ্যোগে ঘাটতি রয়েছে। প্রবাসী শ্রমিকদের কাজের যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নেই প্রয়োজনীয় নজরদারি। বছরের পর বছর অস্বাভাবিক মৃত্যু বাড়তে থাকলেও তা প্রতিরোধে সরকার সক্রিয় হচ্ছে না বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন। অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রতিরোধে সরকারের উদ্যোগে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করাটা জরুরি। স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে দূতাবাসে বিশেষ দল তৈরি করতে পারে সরকার; যারা প্রতিটি মৃত্যু নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে কাজ করবে। ঘটনাস্থল, হাসপাতালে যাবে, যাচাই করবে। সংশ্লিষ্ট দেশের দায়িত্বশীলদের তদন্তে কোনো গাফিলতি দেখলে ওই দেশটির সরকারের ওপর চাপ তৈরি করতে হবে। কিন্তু খুব কমক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটছে। তবে সরকার ২০২২ এর শেষ দিকে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য নতুন বীমাসুবিধার পরিকল্পনা নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এই বীমায় জীবনহানি বা আহত হওয়ার জন্য ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বীমা সুবিধা পাবেন শ্রমিকরা। নতুন বীমাচুক্তিতে প্রিমিয়ামের হারও কমবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পূর্বে এই হার ছিল ৪৯০ টাকা। উপরোক্ত হারে পাওয়া প্রিমিয়ামে জীবন বীমা কর্পোরেশন ২০১৯-এর ডিসেম্বর থেকে ২০২১ এর মাঝে প্রায় ৫৩ কোটি টাকা প্রিমিয়াম পেয়েছে বলে জানা যায়। তার বিপরীতে তাদের বীমা দাবি (মৃত্যুর জন্য ৪ লাখ) পরিশোধ করতে হয়েছে মাত্র তিন কোটি টাকার মতো (২১ আগস্ট ২০২২, টিবিএস)।

উল্লেখ্য, বিদেশে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি কর্মী রয়েছে কুমিল্লা জেলার। এরপরই কর্মী পাঠানোর শীর্ষে রয়েছে চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, টাঙ্গাইল ও ঢাকা। তবে ২০২২ সালের হিসাবে দেখা গেছে প্রবাসী আয় সবচেয়ে বেশি আসছে ঢাকা জেলায়। কারণ, ঢাকা জেলা থেকে যেসব কর্মী যাচ্ছেন, তাঁদের বেশির ভাগ প্রশিক্ষিত ও উচ্চ আয় করছেন।

পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন

দারিদ্র্যের চেয়ে কুৎসিৎ আর কী আছে বিশ্বে? আর, সেই দারিদ্র্য যদি হয় প্রায় স্থায়ী এবং অচ্ছ্যুত বৈশিষ্ট্যসহ? এরকম নজির খুঁজতে বেশি দূরে যেতে হয় না বাংলাদেশে। দেশের আনাছে কানাছে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আবাসিক এলাকাগুলো তার সাক্ষ্য হিসেবে আছে।

বাংলাদেশ যেসব উন্নয়ন ইস্যুতে সংগ্রামরত, তার একটা জাতিসংঘ গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)'। এসডিজির মূল অঙ্গীকার 'কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না'। সমৃদ্ধির ভাগ যাবে সবার ঘরে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, দেশটিতে ছোট ছোট অনেক জনজাতি এখনো 'পিছিয়ে'। যারা অনেকে নিজেদের বলছে 'দলিত'। অনেক এলাকায় এই পরিচ্ছন্নতাকর্মী-সমাজ আছে 'হরিজন' পরিচয়েও। কেউ কেউ যুগের পর যুগ তাদের অবজ্ঞাসূচক 'সুইপার'ও বলেন।

কয়েক শ' বছরের পুরোনো এই ঢাকা শহরে এরকম অবাঙালি-দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কলোনি আছে ১৭টি। পাশাপাশি আছে রবিদাস ও ঋষিদের অনেক 'পাড়া'-'মহল্লা'। এরকম সবার জীবনধারাই দলিততুল্য– পেশা যদিও আলাদা। রবিদাস ও ঋষিরা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার। জুতা তৈরি, সেলাই ও চামড়ার বিবিধ কাজ করেন তাঁরা। শিক্ষার সূত্রে ছড়িয়ে পড়ছেন অন্য পেশাতেও। কিন্তু দারিদ্র্যের চক্র ভাঙ্গতে পারছেন কমই।

কেবল ঢাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মী দলিতদের মাঝে কানপুরি ও তেলেগুর সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। কোনো কোনো কলোনিতে আছে শত শত পরিবারের বাস। ৫-১০ পরিবারের খুদে মহল্লাও অনেক। ঢাকার বাইরেও এরকম মানুষ আছেন। সব মিলে এ রকম নাগরিক সংখ্যা প্রায় অর্ধকোটি।

নিজেদের কোন ভূমি না থাকা এবং পুরানো কাজের জগত থেকে ছিটকে পড়া পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের এমুহূর্তের বড় পারিবারিক বৈশিষ্ট্য।

যদিও কয়েক প্রজন্ম ধরে এই মানুষেরা রাজধানীতে আছেন কিন্তু ঢাকার সঙ্গে তাদের কোন ভূমি-সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। অথচ ঢাকা দেশের প্রধান শহর হয়ে উঠতে পেরেছে এবং টিকে আছে এই মানুষদের সহায়তায়। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা লাখ লাখ মানুষকে এ শহর নিজস্ব ঠিকানা দিয়েছে। কিন্তু দলিতদের অস্থায়ী এবং অতি অপরিসর কলোনি-জীবন শেষ হয় নি। সরকারি খাসজমিতেই তাঁদের বসবাস-উচ্ছেদ-পুনর্বাসন। অনেক কলোনি কয়েকবার উচ্ছেদ হয়েছে। ঢাকার গণকটুলীর কলোনিবাসীরা একদা ছিলেন পলাশীতে ইডেন এলাকায়। গাবতলীর এখনকার দলিত বাসিন্দারা আগে ছিলেন মোহাম্মদপুরে। ধলপুরের তেলেগুরা ওয়ারী ও সায়েদাবাদ হয়ে ১৯৯০-এ এখনকার জায়গায় থিতু হন। কিন্তু পাননি নিজস্ব ভূমি মালিকানা।

রবিদাসরা কোথাও কোথাও সরকারিভাবে বরাদ্দ করা জমিতেই থাকেন এখন। সেই ১৯৪৩ সালে ওয়ারীতে ২৮টি রবিদাস পরিবারকে ৯৯ বছরের ইজারায় একটা থাকার জায়গা দেওয়া হয়। আজ ৭৭ বছর পর ওই একই কলোনিতে পরিবারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২০টি। কিন্তু জায়গা বাড়েনি।

বর্তমান লেখকের নিজস্ব অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ৬০ ভাগ দলিতের মত হলো তারা যেখানে বাস করে সে জায়গার মালিক তারা নয়। এর মধ্যে ৫৫ ভাগ জানিয়েছে, তারা সব সময় উচ্ছেদ-আতঙ্কে থাকে। যেখানে উচ্ছেদ-আতঙ্ক নেই, সেখানেও পুরোনো খুপরির মতো ঘরে থাকতে হচ্ছে একই পরিবারের একাধিক প্রজন্মকে।

এর পাশাপাশি রয়েছে বেকারত্ব। যতই উচ্চশিক্ষিত হোক, দলিত ছেলেমেয়েদের আজও পরিচ্ছন্নতার কাজ ছাড়া অন্য কিছুতে ভাবতে অভ্যস্ত হয়নি দেশের 'মূল সমাজ'। আবার এ রকম পরিবারগুলো সরকারি জায়গায় বাসস্থান টিকিয়ে রাখতে যেকোনোভাবে সিটি করপোরেশনের ময়লা পরিষ্কারের কাজও চায়। তাদের অবশ্যই একটা সরকারি কাজে যুক্ত থাকার সনদ দরকার হয়– না হলে বর্তমান বাসস্থানে থাকা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু এরকম সকল 'চাকুরি' পেতে 'টাকা লাগে' বলে অভিযোগ আছে।

আবার অনেক দাম দিয়ে 'চাকুরি কেনা' এই মানুষদের জন্য সহজ নয়। ফলে বাংলাদেশের কোন শহরেই ময়লা পরিষ্কারের কাজে পুরোনো দলিত 'সুইপার সমাজের' একচেটিয়াত্ব আর নেই। ঢাকায় এ কাজে যুক্ত ৮ থেকে ১০ হাজার কর্মীর মধ্যে তাঁদের সংখ্যা ইতিমধ্যে ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৩০০ তে নেমে গেছে বলে অনুযোগ তাঁদের। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা কর্মী দলিতরা পূর্বপুরুষের পেশায় বাড়তি হিস্যা চায়। ঢাকার

ধলপুর কলোনিতে দেখা গেল ২০৫টি পরিবারের ৭২টিতে সিটি করপোরেশনে কাজ আছে। বাকিরা বেসরকারি নানান প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে তাদের অনাগ্রহ নেই। কিন্তু মুশকিল হলো তাহলে সরকারি খাসজমিতে থাকার 'অধিকার'টুকুও যে চলে যেতে পারে!

সরেজমিনে এও দেখা গেল, সরকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ভবন বানাচ্ছে। ধলপুরে দুটি ভবন উঠেছে; ১২০টি পরিবার থাকতে পারবে সেখানে। ওয়ারীতে ২৪০টি পরিবার থাকার মতো তিনটি ভবন হয়েছে। গণকটুলী ও গাবতলীতে অনেক বহুতল বাড়ি তৈরি হচ্ছে। নাজিরাবাজারেও দুটি ভবনের কাজ চলছে। এসব ভবনে ঢাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আবাসন সমস্যা কিছুটা মিটবে। তবে মানুষের তুলনায় ভবন কম। ধলপুরে নতুন বাড়িগুলোতে ১২০টি পরিবার থাকতে পারবে। কিন্তু পরিবার আছে ২০৫টি। নাজিরাবাজারে ৭০০ ঘরের বিপরীতে দুটি ভবনে জায়গা পাবে সর্বোচ্চ ১০০ পরিবার। বাকিদের থাকতে হবে আগের দেড় রুমের ঘরেই। কারা নতুন ভবনে ঠাঁই পাবে, কারা পাবে না, তা স্পষ্ট নয় কলোনির কারো কাছেই। যেসব পরিবারের সিটি কর্পোরেশনে কাজ নেই তারা ঘর পাবে কি না– এরকম একটা আতঙ্কও আছে।

দলিত পরিবারগুলোর মধ্যে একটি ইতিবাচক দিক হলো শিক্ষার প্রসার হয়েছে গত দুই দশকে। বাবা হয়তো কোথাও রোদ-বৃষ্টিতে জুতা সেলাই করেন, কিন্তু সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন। কলোনিতে যদিও পড়ার পরিবেশ আছে সামান্যই। পাশাপাশি 'গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষার ঘাটতি'র কথা জানালেন ধলপুরের তেলেগু স্কুলের সভাপতি এ যোশেফ দাস। একই আফসোস নাজিরাবাজারে 'হরিজন সংগঠক' গগন লালের। ২০১৩ থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিত কোটায় শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ছে সর্বত্র। সেই কোটা এখনো আইনি মর্যাদা পাওয়ার সংগ্রামে আছে এবং এখনো প্রাথমিক পর্যায়ের দলিত শিক্ষার্থীর ১-২ শতাংশের বেশি স্নাতক স্তর ডিঙাতে পারছে না। অভাব গুণগত শিক্ষার।

অন্যান্য বছরের মতো ২০২২ সালে নীতিনির্ধারকরা বলেছেন, বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমছে এবং মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। কিন্তু যে গতিতে মূলধারার সমাজে এটা ঘটছে, সেভাবে ঘটছে না দলিত শ্রমজীবী পরিবারে। জাতীয় উন্নয়ন ধারার এই ভারসাম্যহীনতা কমাতে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দরকার। এ রকম কর্মসূচির কিছু ঐতিহ্য আগে দু'এক বছরের বাজেটে ছিল। সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে সব হতদরিদ্রকে কোনো না কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। দলিত জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধারাকে এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা দরকার।

এর আগে দলিতদের জন্য শুরু হওয়া অনেক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি 'অনগ্রসর শ্রেণি'র জন্য রূপান্তর করে তার বড় অংশ অদলিতদের দেওয়া হয়েছে। সেসব আবারও 'দলিত'দের জন্য সুনির্দিষ্ট করা যায়। পাশাপাশি অবিলম্বে খসড়া বৈষম্য বিরোধী বিলটি সংসদে আইন হিসেবে অনুমোদন জরুরি। ২০২২ সালে এই আইনের জন্যই ছিল সকল দলিত সংগঠনের মূল তৎপরতা। ২০১৪ সালে, আইন কমিশন, বৈষম্য বিলোপ আইনের প্রথম খসড়া তৈরী করে। পরবর্তীকালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০১৮ সালে বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে এই আইনের খসড়া পরিমার্জন করে। সকল 'বাদ পড়ে যাওয়া' জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা রেখে একটি অভিন্ন খসড়া প্রণয়ন করা হয়, যার দ্বারা বৈষম্যের শিকার সকল নাগরিক– বিশেষ করে দলিতদের জন্য এই আইনের মাধ্যমে সামাজিক অবজ্ঞার প্রতিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ইন্টারনেটভিত্তিক ঠিকা কাজের মানুষদের নেই কোন সংগঠন

দেশের শহরাঞ্চলে নতুন এক কর্মজীবী জনগোষ্ঠী হলেন 'ডেলিভারী ম্যান' সম্প্রদায়। সংখ্যায় বাড়ছেন নতুন ধারার এই বিক্রয়কর্মীরা। পিঠে বা সাইকেলে বড় একটা ব্যাগ নিয়ে ছুটে চলা এরকম মানুষদের হরহামেশাই দেখছি আমরা। সমাজ সংস্কৃতি ও ব্যবসার জগতের চেহারাই পাল্টে দিচ্ছেন এঁরা। মহামারির সময় এই কর্মীরা পণ্য সরবরাহের চাকা বিশেষভাবে চালু রেখেছিলেন। কিন্তু মহামারি শেষেও আছেন তাঁরা।

পুঁজিতন্ত্রের অব্যাহত বিকাশ ও রূপান্তর ধারায় নতুন এই কর্মীদলকে আন্তর্জাতিকভাবে 'গিগ ওয়ার্কারস' হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। কারখানায় বা কোন প্রতিষ্ঠানের দপ্তরে এক সঙ্গে অনেক কর্মী রাখা হলে তাদের মাঝে সংগঠন চেতনা ও দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য দ্রুত সংগঠিত হওয়ার যে বাস্তবতা তৈরি হয় গিগ কর্মীদল সৃজনের মাধ্যমে আধুনিক পুঁজিতন্ত্র সেই সংকট এড়াতে চাইছে। সেক্ষেত্রে কিছুটা সফলও পুঁজিতন্ত্র। ক্রমাগত অস্থায়ী চরিত্রের কাজের জায়গা তৈরি করা হচ্ছে ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে। এই প্রবণতাটি বিশ্বজুড়েই। আমেরিকার মোট শ্রমিক কর্মচারীর ৩৬ শতাংশই এখন যুক্ত আছেন স্বাধীনভাবে নিজের সুবিধামতো সময়ে কাজ করার গিগ প্লাটফর্মে। অন্যদিকে ৩৩ শতাংশ কোম্পানির বেশিরভাগ কর্মীই 'গিগার'।

বাংলাদেশেও শহুরে অর্থনীতি ক্রমে ওইরকম 'গিগ' চেহারা নিচ্ছে। তবে, ইতোমধ্যে সংখ্যায় বেশ হওয়ার পরও বাংলাদেশে ঠিকা কাজের মানুষদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশাগত জোরদার সংগঠন নেই। ফলে কাজদাতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে প্রায় জিম্মি অবস্থায় আছে এই নতুন পেশাজীবীদের আয়রোজগার ও অধিকার।

কারখানা এবং অন্যান্য শিল্প উৎপাদন সংস্থায় স্থায়ী কর্মী বাদ দিয়ে অস্থায়ী শ্রমিক বাড়ানোর যুক্তি হল, এই 'নমনীয়তা' শিল্পের প্রয়োজন। বাজারে পণ্যের চাহিদা ওঠা-নামা করে, কিন্তু যখন চাহিদা কম, তখন শ্রমিক কমানো কঠিন হয়। কারণ, শ্রম আইন মেনে মুখের কথায় যেমন শ্রমিক নিয়োগ দেয়া যায় না– তেমনি তাৎক্ষণিক তাদের ছাঁটাই করাও সহজ নয়। সে কারণে বিভিন্ন সংস্থা খোদ শ্রম আইন এড়ানোর সহজ রাস্তা নিয়েছে– কাজের জন্য চুক্তিভিত্তিক 'ঠিকা কর্মী' সংগ্রহ করে।

প্রায় একই রকম অবস্থা মটরসাইকেল রাইডার হিসেবে পরিচিত স্বাধীন সেবাকর্মীদের। অনেকে এরা 'উবার' এবং 'পাঠাও'সহ কিছু অ্যাপনির্ভর কম্পানির সঙ্গে কাজ করেন– কিন্তু সেই সম্পর্কও অধিকারবান্ধব নয়। বাসা-বাড়িতে কাজ করা 'ঠিকা' বুয়াদেরও এই তালিকায় ফেলা যায়। নির্ধারিত 'কাজ'টুকু হওয়া মাত্র এদের প্রতি কারো কোন দায়িত্ব নেই।

এরকম পেশাগুলোর বিকাশ হচ্ছে ইন্টারনেট সুবিধার ভিত্তিতে ফেসবুকের মতো যোগাযোগ অ্যাপকে ভর করে। শ্রমিক আইনেও এ ধরনের 'ঠিকা' কাজের নতুন পেশাজীবীদের সংজ্ঞায়ন নেই পুরোপুরি। ফলে পেশাগত স্বার্থ সুরক্ষার লড়াইয়ে আইনগত সহায়তা পাচ্ছেন না তাঁরা। শ্রম বিশেষজ্ঞরা বলছেন অবিলম্বে এই কর্মীদের সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে শ্রম আইনের পরিবর্তন দরকার।

একজন ডেলিভারি ম্যান মূলত কোন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কাস্টমারের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে থাকেন। এরই একটা বিস্তৃত রূপ মোটর সাইকেলে যাত্রী পরিবহন। যা ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বেশ বড় এক কাজের খাত হয়েছে তরুণদের কাছে। এরকম বিবিধ ডেলিভারি সার্ভিসের পাশাপাশি ইন্টারনেটভিত্তিক বেচাকেনার প্রসারের কারণে বর্তমানে দেশের শহরাঞ্চলগুলোতে 'গিগ' পেশার বিকাশ ঘটছে তুমুল গতিতে।

এই কাজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য

- স্বাধীনভাবে কাজের সুবিধা; চাইলে সহজে কর্মস্থল বদলানো যায়। আবার কাজদাতাও সহজে কর্মী পাল্টে ফেলে;
- কাজের ধরন স্বল্পমেয়াদী ও চাহিদা-সাপেক্ষ; ৯টা-৫টা জাতীয় কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কর্মীদের দিয়ে দিন রাতের অন্য সময়ও কাজ করানো যায়। আবার যেকোন

কর্মী বেশিসময় কাজ করে বেশি আয় করতে পারে।

- কর্মীরা কখনো কখনো ঘরে বসেও কাজ করতে পারে; আবার মালিকরা কাউকে ঘরে বসিয়ে স্থায়ী শ্রমিকের কাজ করিয়ে নিতে পারে কারখানা-শ্রমিকের অনেক অধিকার না দিয়েই; 'মালিক'দের পক্ষে শ্রম অধিকার এড়িয়ে কর্মীদল পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে।
- অফিস ধারণাটি অনেক পাল্টাচ্ছে। আগের মতো কোন একটি ভবনে অফিস থাকতে হবে– এমন বাধ্যবাধকতা এখন কমছে। যার কারণে অফিস সম্পর্কিত খরচ– যেমন, ভাড়া, বিদ্যুৎ, পানি, আপ্যায়নসহ অন্যান্য ওভারহেড খরচের পরিমাণও পাল্টাচ্ছে।
- ফ্রিল্যান্সার হিসেবে একজন কর্মী বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে কাজের জন্য আবেদন করতে পারেন; অনেক বিদেশী প্রতিষ্ঠান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কর্মীদের দিয়ে অনেক কম মজুরিতে কাজ করিয়ে নিতে পারে;
- অ্যাপের মাধ্যমে দূরের কাজও পাচ্ছে কর্মীরা; মালিকরাও যেকোন দূরবর্তী স্থানের কর্মী সংগ্রহ করে নিতে পারে এবং তাকে দিয়ে প্রত্যাশিত কাজ করিয়ে নিতে পারে; অদক্ষ কর্মীকে বাদ দিয়ে দক্ষ কর্মীকে বেশি কাজ দেয়া সম্ভব।
- কাজের সম্পর্কটি অ্যাপভিত্তিক; ফলে শ্রম আইনের সংজ্ঞায় এখানে কাউকে 'মালিক' ও 'শ্রমিক' সংজ্ঞায়ন সহজ নয়।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর সারমর্ম হলো: চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীদের কাজের নিরাপত্তা নেই, বেতনের নির্দিষ্ট কাঠামোও নেই। দীর্ঘ দিন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পরেও মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা ছাঁটাই হয়ে যেতে পারেন, কোনও কারণ ছাড়াই; কোন ধরনের সুবিধা ছাড়াই। তাঁদের নেই উৎসব বোনাস, নেই মাতৃত্বকালীন ছুটি।

তারপরও কাজের এই ধরনটি এ কালের নতুন প্রবণতা। আগামী দিনে সব দেশেই স্থায়ী চাকরি, মাস গেলে মোটামুটি একটা ভদ্রস্থ মজুরি, ডি এ, অবসরকালীন গ্র্যাচুইটি, পেনশন এইসব কেবল স্মৃতি হয়ে থাকবে যে ভবিষ্যৎ পড়ে থাকবে তা হলো দুবেলা-দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে ৩৬৫ দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দৌড়াতে হবে স্বল্পমেয়াদী চুক্তির অস্থায়ী চাকুরির পিছু পিছু। শরীর স্বাস্থ্য ও খাওয়া দাওয়ার তোয়াক্কা করা যাবে না। জীবন নিয়ে কেবল দৌড়ওওও। পুঁজিতন্ত্র মানুষের এই পরিণতি নির্দিষ্ট করে নিয়েছে আপাতত। এ বিষয়ে এক লেখকের মন্তব্য:

সমাজে রয়েছে বিশাল বেকার বাহিনী। তারই একাংশ অভাব সামলাতে ধারকর্জ করে বা জমি বেচে একটা গাড়ি কিনছে।

তারপর হাজির হচ্ছে অদৃশ্য কম্পানির অ্যাপের কাছে এবং শুরু হলো তার জীবনের অন্তহীন দৌড়পর্ব। যত দৌড়াবে তত কমিশন। ঠিক ভাবে দৌড়াতে না পারলে রেটিং যাবে কমে। কমিশন হারাতে হতে পারে, এমনকি কাজের চুক্তিও চলে যেতে পারে। মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তরা বাড়িতে বসেই আজকাল দূরের নামকরা দোকানের খাবার খেতে চান। সে প্রত্যাশা পূরণ করে দেয় এরকম দৌড়াতে থাকা তরুণ-তরুণীরা। বিত্তবানরা সেই খাবার খেয়ে যখন তৃপ্তির বিশ্রামে থাকেন ততক্ষণে একজন গিগকর্মীকে ছুটতে হয় আরেক ঠিকানায় আরেকজনের খাবার নিয়ে।

ঢাকার অ্যাপ-ভিত্তিক 'বাইক সার্ভিসে'র কয়েকজন চালকের সাথে কথা বলে যে অভিজ্ঞতা হলো তা হচ্ছে প্রায় দুই লাখ বাইকার এখানে বিভিন্ন অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাত্রী পরিবহন করে। যাত্রীর থেকে পাওয়া আয়ে অ্যাপভিত্তিক কম্পানিকে তাদের দিতে হয় প্রায় ২০ ভাগ কমিশন। এটা পুঁজিতন্ত্রের এক মজার দিক। কোনরকম বড় বিনিয়োগ ছাড়াই কম্পানি প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আয় করছে। কিন্তু কর্মীর জীবনের বাড়তি কোন দায় নেই তার। রাইডার যদি যাত্রী পরিবহন করতে যেয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে তার জন্য ভার্সুয়াল কম্পানি দায়িত্ব নিতে নারাজ।

অর্থাৎ সমস্ত দিন পার্কিং নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা, দুর্ঘটনার ক্ষতি, লাইসেন্সের যন্ত্রণা সব দায়ভারই মূলত গাড়ির চালকের বা মালিকের। এই চালকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন জগতে বাংলাদেশে আপাতত কেউ নেই। তারা 'শ্রম আইনের বাইরের মানুষ'। শিল্পের বিকাশ এবং অর্থনীতিতে অপরিহার্য হলেও লাখ লাখ মানুষকে নানানভাবে শ্রম আইনের বাইরে রাখার এই কৌশল এ বছরের মতোই সামনের বছর বড় প্রবণতা হয়ে উঠবে বলেই মনে হচ্ছে।

সীতাকুণ্ড বিস্ফোরণের শিক্ষা আমরা কাজে লাগিয়েছি তো?

প্রতিবছরের মতোই এ বছরও বর্তমান সংকলনে সাম্প্রতিক একটি বড় শিল্পসংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনার খবর সংকলিত করতে হচ্ছে। বলা যায়, এটা বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যের একটা দিক। বছর বছর এখানে এরকম দুর্ঘটনা ঘটছে অথচ তাকে প্রতিরোধ করার পদক্ষেপগুলো প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পাচ্ছে না। চট্টগ্রামের সিতাকুন্ডে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ২০২২ সালের ৫ জুন রাতে বিএম কনটেইনার ডিপোতে। দুর্ঘটনার সংবাদ প্রথমে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে দুর্ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির ফেসবুক লাইভ থেকে। এরকম ফেসবুক লাইভকারী অনেকে দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বাড়ার মুখে মারাও যান। আগুন লেগেছিল ডিপোর কেমিক্যালের কনটেইনারে। এসব কনটেইনার এখানে জড়ো করে রাখা হয়েছিল। বিস্ফোরণের সময় পানির মতো কেমিক্যাল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেসব তরল যেখানে যেখানে লেগেছে সেখানেই আশপাশটা পুড়ে গেছে। ধোঁয়া আর আগুনে চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল এসময়। ৮৭ ঘণ্টা পর এই আগুন নিভে আসে। প্রাথমিকভাবে এই দুর্ঘটনায় মারা যান ৪৬ জন। দমকল বাহিনীর নয়জন সদস্যও প্রাণ হারায় এতে। প্রায় ২০০ জন এতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। অনেকে নিখোঁজ ছিলেন। এমনকি প্রায় চার মাস পর ৭ অক্টোবর প্রথম আলোতে এক সংবাদে দেখা যায়, একজন পিতা এখনও তাঁর সন্তানকে খুঁজছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়:

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম কনটেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণের চার মাস পেরিয়ে গেলেও মো. ইয়াছিন (২৮) নামের এক তরুণের সন্ধান পায়নি তাঁর পরিবার। ছেলেকে জীবিত কিংবা মৃত হলেও পাওয়ার জন্য ঘটনার পর থেকে হন্যে হয়ে খুঁজেছেন তাঁর বাবা। এ জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিজের ডিএনএ নমুনাও দিয়েছিলেন। চার মাসেও ইয়াছিনের বিষয়ে কোনো তথ্য না পাওয়ায় মুষড়ে পড়েছে এ পরিবার।

ইয়াছিনের বাবা বদিউল আলম জানান, তাঁর ছেলে বিএম কনটেইনার ডিপোর লরি চালক ছিলেন। গত ৫ জুন ডিপোতে বিস্ফোরণের পর থেকে সে নিখোঁজ। দুর্ঘটনার পর থেকে ছেলের খোঁজে চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরছেন এই পিতা। হাসপাতাল থেকে লাশের বিষয়ে তখন পর্যন্ত কোনো তথ্য পাননি তিনি।

বাংলাদেশে দমকল বাহিনীর কর্মকর্তারা ৫ জুন বিবিসিকে বলছেন ডিপোতে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড রাসায়নিক যৌগ থাকার কারণে সেখানে এতো বড় বিস্ফোরণ ঘটেছে। তাঁরা বলেছেন, ডিপোর কয়েকটি কন্টেইনারে অত্যন্ত দাহ্য এই রাসায়নিক ছিল। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড মূলত অক্সিডাইজিং এজেন্ট। অস্ট্রেলিয়ার ডেঞ্জারাস গুডস কোড অনুসারে, অক্সিডাইজিং এজেন্ট হচ্ছে এমন পদার্থ, যা নিজে সরাসরি দাহ্য না হলেও অক্সিজেন নিঃসরণ করে। ফলে এটা দহনে মারাত্মকভাবে সাহায্য করে। এছাড়া এটা একটা ক্ষয়কারী যৌগ। সীতাকুণ্ডের কন্টেইনার ডিপো থেকে উদ্ধার করা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের কন্টেইনারে ৬০ শতাংশ ঘনত্ব লেখা দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ এই ঘনত্বের হাইড্রোজেন পারক্সাইড অতি সাবধানে রাখার কথা ছিল।

দমকল বাহিনীর পরিচালক লে. কর্নেল রেজাউল করিম আগুন নেভানোর কাজ তদারকি করার সময় বিবিসি বাংলাকে বলেন, ডিপোতে 'শুধু একটা বিস্ফোরণ ছিল না। কিছুক্ষণ পর পর থেকে থেকে বিস্ফোরণ হয়েছে। আগুন যখন একটা কন্টেইনার থেকে আরেকটা কন্টেইনারে গিয়ে লাগছিল তখন একটা একটা করে বিস্ফোরণ হচ্ছিল।'

উল্লেখ্য, এই ডিপোটি প্রায় ২৬ একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। বিস্ফোরণকালে সেখানে শত শত কন্টেইনার ছিল। দুর্ঘটনা থেকে বোঝা যায় এসব কনটেইনারের সুরক্ষা কাঠামো ও নজরদারি দুর্বল থাকার মতো কিছু ঘটে থাকতে পারে। এসব কন্টেইনারে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ছাড়াও আরো কোন রাসায়নিক ছিল কিনা সেটাও তদন্তকারীদের সন্দেহের তালিকায় ছিল। সেখানে রপ্তানির জন্য গার্মেন্টসের তৈরি পোশাকও ছিল বলে কর্মকর্তারা জানান। এই ঘটনায় দমকল বাহিনীর অন্তত সাতজন কর্মী শুরুতেই নিহত হন। আরো কয়েকজন নিখোঁজ ছিলেন। বাংলাদেশে কোনা একটি অগ্নিকাণ্ডে আগুন নেভাতে গিয়ে এই বাহিনীর এতো কর্মীর প্রাণহানি আর কখনো ঘটেনি।

দমকল বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এরকম শিল্প দুর্ঘটনায় আগুন থামানোর মতো প্রশিক্ষণ এবং যন্ত্র-সামগ্রী দমকল বাহিনীর রয়েছে। কিন্তু এই ডিপোতে যেসব রাসায়নিক-ভর্তি কন্টেইনার ছিল দমকল বাহিনীর কর্মকর্তাদের সেসব তথ্য

জানা ছিল না। ফলে কর্মীরা যখন আগুন নেভাচ্ছিলেন তখনই পরের বিস্ফোরণগুলো ঘটতে থাকে। তাতে প্রাথমিক যে দলটি কাজ করছিল তাদের কয়েকজন মারা যান।

দমকল বাহিনীর জীবিত কর্মীরা আরও বলেন, 'আমরা যদি জানতে পারতাম এখানে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড রাসায়নিক পদার্থ আছে তাহলে আমরা সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারতাম। রাসায়নিক বিশেষজ্ঞরা তাদের সরঞ্জাম নিয়ে আগেই সেখানে যেতে পারতো। ঘটনাস্থলে মালিকদের কেউ না থাকায়ও সমস্যা হয়েছে। দমকলবাহিনী তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। তাতে করে বিস্ফোরণের ব্যাপকতা বেড়েছে। হতাহতের সংখ্যাও বেড়েছে।

মামলা

বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলা হয়েছে। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ডিপোর আট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মামলায় আসামি করা হয়েছে। সীতাকুণ্ড থানায় মামলাটি করেন উপপরিদর্শক (এসআই) আশরাফ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, 'বিএম কনটেইনার ডিপোতে অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ঘটনায় অবহেলার অভিযোগে মামলাটি করা হয়েছে। মামলায় ডিপোর আট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আসামি করা হয়েছে।' মামলার আসামিরা হলেন কনটেইনার ডিপোর মহাব্যবস্থাপক নাজমুল আক্তার খান, উপমহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) নুরুল আক্তার খান, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) খালেদুর রহমান, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্বাস উল্লাহ, জ্যেষ্ঠ নির্বাহী (প্রশাসন) নাছির উদ্দিন, সহকারী ব্যবস্থাপক আবদুল আজিজ, ডিপোর শেড ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম ও সহকারী ডিপো ইনচার্জ নজরুল ইসলাম। লক্ষ্যণীয় যে, এই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ডিপোর মালিকদের কারো নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

উল্লেখ্য, দুর্ঘটনাকবলিত ডিপোর মালিকদের সম্পর্কে তথ্য নিয়ে বিবিসি ৫ জুন লিখেছে: বিএম কন্টেইনার ডিপো লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসাবে রয়েছেন ডাচ নাগরিক বার্ট প্রঙ্ক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে রয়েছেন মো. মোস্তাফিজুর রহমান। এই ব্যক্তিদের আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন, আবাসিক কোম্পানি সিটি হোম প্রোপার্টিজ লিমিটেড, একাধিক গার্মেন্টস কারখানা, জ্বালানি প্রতিষ্ঠান, শেয়ার অ্যান্ড সিকিউরিটি এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকা। 'বিএম' শব্দটি সম্ভবত বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডের ইংরেজি বানানের প্রথম দুই বর্ণ থেকে নেয়া।

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের ওয়েবসাইটে চেয়ারম্যান বার্ট প্রঙ্ক সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তিনি একজন ডাচ নাগরিক এবং নেদারল্যান্ডসের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী। তিনি বাংলাদেশের একাধিক ব্যবসা খাতে বিনিয়োগ করেছেন এবং চট্টগ্রাম ডেনিম মিল লিমিটেড, বিএম কনটেইনার ডিপোর মতো প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন। মো. মোস্তাফিজুর রহমান সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বাংলাদেশের একজন বহুমুখী উদীয়মান উদ্যোক্তা, যিনি বৈশ্বিক বাণিজ্যের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে ধারণা রাখেন। বিশ্ব জুড়ে শিল্প পরিচালনার তার অভিজ্ঞতা আছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি কেউ গুরুত্ব দিল না

ডিপোতে বিস্ফোরণে আশেপাশের বাড়িঘর ও পরিবেশের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতারের দাবি ছিল আশেপাশের এলাকাবাসীর। কিন্তু পুলিশের নিষেধাজ্ঞায় এলাকাবাসী সামান্য মানববন্ধনও করতে পারেনি সেসময়।

এরকম এক ব্যর্থ উদ্যোগের পরদিন সোনাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জাহেদ সুলতান চৌধুরী ইত্তেফাককে বলেন, পুলিশ আগেরদিন রাতে গ্রামবাসীকে কোনো ধরনের মানববন্ধন করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে যায়। এ কারণে নির্ধারিত মানববন্ধন করা যায়নি। তবে অনেকে তাদের নিখোঁজ আত্মীয়-স্বজনের ছবি সম্বলিত পোস্টার নিয়ে বিএম গেটের সামনে অবস্থান নিয়েছেন বিভিন্ন সময়।

এসব দেখে সারাবাংলা পোর্টালে ৭ জুন জাফর হোসেন জাকির নামে একজন লেখক প্রশ্ন তুলেছেন: কর্মরত শ্রমিকদের ঝুঁকিতে ফেলে হাজার হাজার মানুষের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে এতবড় দুর্ঘটনা ঘটানোর আয়োজন কি একদিনে হয়েছে? এই ডিপোটির দিকে সরকারের পূর্ণাঙ্গ নজরদারি ছিল কি না? যদি থাকে তাহলে সময়মতো সঠিক তথ্যের অভাবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীসহ নিহত শ্রমিকদের মৃত্যুর দায় কার? সর্বোপরি এই দুর্ঘটনার শিক্ষা বাংলাদেশে দুর্ঘটনামুক্ত কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার কাজে লাগানো হবে কি না?

তবে এরকম ভাবনার মাঝেই ১৩ ডিসেম্বর এই ডিপোতে আবার এক অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

আজও শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড খুঁজছে বাংলাদেশ

গত ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশে অনেক বড় বড় শ্রম দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি দুর্ঘটনার পর ২-৩ বছর এসব দুর্ঘটনার বার্ষিকী পালিত হয় ব্যাপক শোক ও ক্ষোভের সঙ্গে। তারপর আস্তে আস্তে শোক ও ক্ষোভ কিছুটা কমতে থাকে এবং ইতোমধ্যে আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এরকম দুর্ঘটনা প্রতিসময় ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে আসে। শিল্প দুর্ঘটনার এত বিপুল নজিরের পরও বাংলাদেশে আজও বিতর্ক চলছে দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের বা তাদের পরিবারের কী পদ্ধতিতে এবং কত অর্থ ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত?

শ্রমিকরা বরাবরই বলছেন ক্ষতিপূরণ দেয়ার বর্তমান বিধান অপ্রতুল। বর্তমানে শ্রমিকরা দুর্ঘটনায় মারা গেলে দু'লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো এটা বাড়ানোর দাবি করছে। তবে কেবল ক্ষতিপূরণের অংক বা পদ্ধতিই নয় ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উপায়ও বহু আমলাতান্ত্রিকতা ও হয়রানিতে ভরা থাকে এখানে। ক্ষতিপূরণকে শ্রমিকের অধিকারের বদলে দান ও দয়া হিসেবে দেখা বা দেখানোর মনোভাবও দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে আজও এখানে এই উপলব্ধি তৈরি হয়নি যে কর্মস্থলের নিরাপত্তা মালিকদেরই নিশ্চিত করতে হবে এবং কাজ করতে যেয়ে শ্রমিক ক্ষতির শিকার হলে তার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ তার প্রাপ্য এবং তা পাবে সহজ উপায়ে। অর্থাৎ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে একটি মানদন্ড থাকা প্রয়োজন। যাতে হতাহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে না হয়। এ বিষয়ে আলোকপাত করতে যেয়ে ২০২২ সালের ২৬ এপ্রিল ঢাকায় এক সেমিনারে শ্রমিক নেতা ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন, ক্ষতিপূরণের সমাধান কেবল এক দুই লাখ টাকার অংকে হতে পারে না। এর জন্য আইএলও কনভেশন ১০২ ও ১২১-কে মানদন্ড ধরে শ্রমিকের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে হবে। সুতরাং সরকারকে এসব কনভেনশন অনুসমর্থন করতে হবে। পাশাপাশি দেশে শ্রম আদালতের সংখ্যাও বাড়াতে হবে।

উল্লেখ্য, বিদেশী ক্রেতাদের চাপে পোশাক খাতের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে সরকার ব্যাপক মনযোগী হওয়ায় এ খাতে বর্তমানে দুর্ঘটনা কমে এলেও অন্যান্য খাতে নানান দুর্ঘটনা ঘটছেই। শ্রমিকদের দাবি কাজ করতে যেয়ে ক্ষতির শিকার হলে পুরো কর্মজীবনের রোজগারের সমান ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ বেঁচে থাকলে এই শরীর দিয়ে তিনি অন্তত সেটা আয় করতেন। মাননীয় হাইকোর্ট এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে নিয়ে একটা কমিটি করতে বলেছিল ২০২১ সালে। তার অগ্রগতিও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা যায় না।

Labor Market and Labor Mobility 2022

Three challenges: Economic recession, inflation, automation

There is no remarkable change happened in the labour market and labour economy in 2022 but government initiatives for the improvement of workplace health, safety and labour standard were continued as like as previous years. Some examples of which could be included as: the Amendment of Labour Rules-2015 was done; the initiative of amending the Labour Act-2006 was going on. Furthermore, labour related disputes and violence were in a controlled instead of spreading. However, negative trends in the labor market had been prevailing, which many experts were titled as 'stagflation'. That means -- inflation, rising commodity prices and high unemployment in the country have all started together. Associated with this is a decline in real wages and a slowdown in national growth

A slowdown in investment and a contraction in consumer spending caused by rising commodity prices kept the employment rate low last year. Lower consumption forces producers to produce less. With one or two exceptions, workers' wages in almost no sector increased – on the contrary, real wages decreased. The situation was the same all over the world. As a result, overseas employment from Bangladesh did not happen as expected.

When the economy was expected to recover nationally after the pandemic subsided, the Ukraine war and the subsequent economic crisis began. The government also announced an austerity policy at the time. Allocations for many lesser important projects were suspended or slashed. Due to the foreign currency reserve crisis, the government was reluctant to embark on major new projects in the latter half of the year. These also reduced the flow of internal employment.

In the middle of the year, ILO said in a report on August 12 that the unemployment rate among Bangladeshi youth is currently 10.6 percent, although the national unemployment rate is 4.2 percent. Quoting another ILO report on January 18, daily Dhaka Tribune wrote: 'About 3.6 million people in Bangladesh will be unemployed in 2022. This is at least 5 lakh more than the pre-pandemic period.' Naturally, the economic recession that started a few months later caused unemployment to rise even higher than the ILO's estimate. Surveys of local institutions have shown unemployment rates to be significantly higher than those of the ILO. Incidentally, at this special moment of the historical turning point of population growth, the youth demographic in Bangladesh is much higher than that of children and the elderly. Sociologists have been saying for a long time that if the youth cannot be engaged in productive work, it can create social instability in the long run.

Shades of global recession in apparel sector

Due to the pressure of the economic slowdown in Europe and America, there was no opportunity in Bangladesh to increase the number of workers in the garment industry - the major sector of urban employment in Bangladesh. Although, this year there was work due to

export of goods from old purchase orders, the purchase orders for the following years are decreasing according to the report (29 August 2022). US multinational retailer Walmart in August canceled hundreds of billions of dollars worth of purchase orders from manufacturers around the world. This has been a cause of concern for many businessmen of Bangladesh, considering the fact that Walmart is currently one of the top purchasers of clothes made in Bangladesh.

In another major area of mass employment in the country, the construction sector was also under challenge due to the increase in price of steel rods and cement. In the span of 12 months, the price of cement has increased by about one hundred taka per bag. Bangladesh Auto Re-Rolling and Steel Mills Association President Manwar Hossain told the daily TBS (The Business Standard) on March 17 that the cost of importing scrap iron - the main raw material of rods - was $435 per ton. It has now reached $500 after the Russia-Ukraine war broke out. Manwar Hossain said that if the Russia-Ukraine war lasts longer, the price of these construction materials may increase further. Amidst these trends, the construction sector - both urban and rural - was no longer able to provide employment to a large number of workers at the end of the year, in spite of the fact that every year millions of young people enter the labor market in this country.

Due to the increase in unemployment, the dependence of other members of the family on the working members in the families has also increased. This – in turn - has worsened the overall poverty situation of the country. Possibility of famine in Bangladesh was also widely discussed this year. It should be noted that inflation was reaching double digits at different times of the year, as per the official figures. According to the March 2022 report of the non-governmental research organization South Asian Network on Economic Modeling (SANEM), the overall inflation rate in urban areas stood at 12.47 percent. And in villages, this rate is 12.10 percent. It can be said for sure that this rate has skyrocketed in August 2022 due to the abnormal increase in the price of fuel oil. The same picture of overall 'stagflation' was being captured all over the cities in the long queues in front of the TCB (Trading Corporation of Bangladesh) trucks selling essentials at fair prices and in the morning floating 'Sramik

Bazars' (worker market). There were no social protection programs specifically for the laborers except for a limited initiative to sell rice and pulses at low prices, even though the labor unions had such strong demands during the budget period. The recession has also greatly worsened the plight of workers in the informal sector. They accounted for nearly 80 percent of the labor economy in previous years and that trend continued in 2022 as well. The amendments to the Labor Code this year also had nothing for the informal sector. Rather, the new amendment has scope to reduce the maternity benefits of women in the institutional sector.

Speed in automation

Along with economic recession and inflation, automation has also affected the labor sector in many ways over the years. Due to the increasing use of various types of machines in the work of land preparation, rice planting and threshing, the need for farm laborers has decreased more than before. While in the clothing industry, as the era of machine-based production has started, the demand for male workers instead of female workers is increasing lately. Sirajul Islam, president of the Bangladesh National Garment Workers' League, told a news portal called 'Aaj Sarabela' on April 10 that factories used to have at least one assistant or helper as opposed to two operators. But modern machinery has arrived in big factories now. As a result, the need for assistants is running out.

The above two realities of automation in agriculture and industry are coming out as emerging trends in the need for nationally comprehensive training to rehabilitate those who have lost their jobs. Citing a survey conducted among 7,000 workers by the national research organization BIDS (Bangladesh Institute of Development Studies), daily TBS reported on September 3 that less than four percent of workers in the country's labor sector receive training facilities, and in overall, the labor skill gap with demand in the country's main sectors is about 30 percent. Annual worker training rate in clothing and textiles is less than one percent. Very few industrial organizations invest in improving their workers' professionalism and skills. Again, low labor efficiency makes foreign investment less attractive. Combining all these

factors, the working people of Bangladesh have fallen into a vicious cycle of low efficiency-low investment-low productivity-low wages. The above survey by BIDS showed that among the expatriate workers, about 47 percent are going abroad without any special job skills. Decades ago, the share of unskilled workers was similar as well. That is, national efforts to increase the skills of workers have not progressed as expected. Bangladesh is in the same position as before. All this happened after a decade long campaign of 'high growth'. This means growth has not taken any long-term initiatives to increase productivity by providing training to workers. The fact that the education structure of the country has not been adjusted to the emerging needs of the working world can well be understood by the disinterest of the industrial economy towards the highly educated youth. At the same time, high growth has not played a major role in the dynamics of rural economy. The side effect of which is that there is nothing more for the youth of the village to do except to go abroad as a laborer or try to move towards the city in search of fortune. Climate change is making this situation unbearable. 2022 also saw a dramatic change in the seasonal pattern of the weather. Reports of losses have increased as the long monsoon and early winter rains hit the agricultural sector.

The concern of the previous years about the lack of decent work environment in the urban labor sector perpetuated this year too. The death of a large number of firefighters in the Sitakunda accident in Chattogram has created a call for more national precautions to prevent industrial accidents. The demand for a safe working environment for workers in all sectors, both formal and informal, has gained renewed relevance after the Sitakunda accident. However, this year the workers in the tea sector have been able to increase their wages by Tk 50 per day through their movement. In their movement, the social cohesion of the middle class society via social media was quite evident.

Despite all of these, Bangladesh has strengthened its position in following international labor standards by ratifying ILO C 138 on minimum age limit. It is to note that Bangladesh also has ratified the ILO C 182 (The Worst Form of Child Labor) and Bangladesh is one of the earliest ratifying countries. At this time, workers and civil society organizations has demanded to ratify ILO Convention 190 on eliminating violence and harassment in the world of work.

Highlights of SRS Intervention in 2022

SRS has sensitized workers of various sectors including construction, garments, stone crushing and tannery with an effort to improve workplace health, safety, and labor standards. Organized various campaigns including training, discussion meetings, exchange meetings on workers' health, safety, gender, environment and labor laws. SRS has assisted permanently disable workers and the dependants of deceased workers to get BDT- 1,000,000 (one million) as compensation through free legal aid and also helped to get BDT- 30,000 (Thirty Thousand) as financial assistance from the Bangladesh Labor Welfare Foundation (BLWF). To make the national budget transparent, accountable and to improve consciousness amongst all spheres of people, SRS has organized various meetings, campaigns and coordination meetings including Peoples Budget Assembly (PBA). About 100 workers have been provided counseling services for psychosocial support and legal advice. Due to economic recession, inflation, automation, workers have suffered discriminately throughout the year. SRS is endeavoring to cooperate with them to improve the quality of their life.

Workers lose jobs due to climate induced disaster, demand for rehabilitation increases

Bangladesh is one of the major victims of climate change and this is recognized worldwide. News coverage of the year 2022 showed how the poor and marginalized people were affected due to climate related natural disaster.

Lately the impact of climate change is increasing. Local workers are one of the worst victims of the natural disasters that occur regularly in Bangladesh, especially the informal workers. Many workers have lost their old professions and jobs and are seeking refuge in the divisional towns. The slums of the capital are overflowing with such people, due to which poverty is comparatively high in the city than in the villages now. This vicious link of urban poverty with climate refugees has become a new crisis in the labor market in Bangladesh.

Historically floods, cyclones, droughts, tidal waves, tornadoes, earthquakes, river erosion, water loggings are the big problems in this country. But in recent years some of these have become more intense than in the past. Salinity of the soil is increasing. Due to irregular floods, rains and river flows, river erosion is increasing as well. In consequence, land and resources are being destroyed. Many people are becoming homeless. The government has identified these as major natural disasters. Foreign quarters are also aware of these issues. But the victims are not being rehabilitated to the extent that expected.

The government now spends 6 to 7 percent of the overall national allocation annually on development and other sectors to counteract the impacts of climate change. That amount is equivalent to about one billion dollars in terms of currency. But the priority list does not mention laborers separately. As a result, the flow of needy people towards the city cannot be stopped. No permanent economic solution has been provided to their families. By that, the problems of the rural area coming to the city are taking on the look of a permanent national problem.

About 88 percent of the livelihood in Bangladesh still depends on the agriculture sector. As a survey of 2020, about 37.75 percent of the country's total labor sector is involved in agriculture.

Though, rainfall during the onset and pre-monsoon season has decreased but rainfall in the early monsoon, late monsoon and late season has increased. Even in winter, it rains like monsoon sometimes. In October 2022, there was a 3-4 days storm at the beginning of winter. Climate change is thus causing changes in the timing and amount of rainfall. It is nearly impossible to save and use water as before for farming and other uses. The overall rainfall is also low. The unilateral water withdrawal by India in the upstream has caused the ground water level to drop down in the northern region of Bangladesh. As a result, agriculture in the northern region, one of the main sources of food grains, is at extreme risk. Costs in agriculture are increasing. As a result, both agriculture and employment in agriculture are declining. In this way, the surplus labor force being created in the village is forced to look for survival in the city or outside the country.

Experts are already saying that the risk of life of the people living in the villages along the Padma River will increase due to the impact of climate change disasters. Padma is one meter below the sea level. About 90% of the people living on the banks of the Padma are engaged in agriculture, fishing, etc. Fishermen families are already in danger. In addition to losing their jobs, they have been facing with a shortage of fresh water. In this reality, alternative vocational training and rehabilitation are needed to protect the quality of life of those involved in fishing. They can be encouraged in marine fisheries or brought into the fish processing business. However, apart from training, various incentives including interest-free loans, technical assistance, life insurance are needed. The more these are delayed, the more these people are slowly running towards uncertainty and the unknown destination.

In the face of such reality, the high inflation of goods started in 2022. The international news agency Reuters published an important report about Bangladesh on September 27, 2022. That said, urbanized people are falling into the trap of rising inflation at a higher rate as a result of climate change. After moving to the city, they have nowhere else to go. Due to the rising fuel prices and increasing costs in all sectors of life, they are now disoriented. Many people said, it is not possible to live like this.

Reuters has profiled some such people in their report. For instance, 50-year-old Arzina Begum works in a garment factory at the west of Dhaka, Hemayetpur. She lives in a small, damp rented house. She said that the monthly salary of 15 thousand taka is not enough for her and her son. She states, the way the prices are increasing, it is becoming difficult to survive on this salary. So, 'to increase my income, my 15-year-old son had to join a workshop.' Regarding the situation, leader of the Garment Workers' Rights Movement, Taslima Akhtar Beauty said, to meet the needs of the family, the workers' salary should now be increased to Tk 20,000 to Tk 25,000. There is yet no indication that this will be happened.

Another person named Hazrat Ali lived near Arzina's house. He earns 9 thousand taka a month. As a result of such low income, he said that concerns regarding his family's food security are gradually increasing. Hazrat Ali said if the price continues to rise like this, it is impossible to live a month by this wage. Regular rations of food items like rice, lentils and oil are required.

Reuters also wrote that Prime Minister Sheikh Hasina has also discussed openly about how common people are suffering from the shock of increased prices. She promised that the government will take steps to ease this burden. The government is selling essential food products directly to the people at subsidized prices. But the subsidy is not reaching to all those who need it most. Analysts say many people are now cutting back on their spending by cutting back on eating out. They are suffering from food poverty.

Surely, there is no quick fix to this situation. But initiatives need to start now. For this, it is necessary to focus on the rehabilitation of workers affected by climate change and disasters in both rural and urban areas. It has become imperative to provide them with training, capital and necessary marketing support for alternative occupations. In the interim, they need special social security programs where the sole aim of the program will be to assist in the rehabilitation of laborers who have been displaced or lost their jobs due to climate induced natural disasters.

Grimy life of sanitation workers

What is worse than poverty in the world? And, what if that poverty is almost permanent, with inexhaustible features? One does not have to go far in Bangladesh to find such precedents. The housing of the cleaners all over the country is a testimony to this.

One of the development issues that Bangladesh is struggling with is the Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by the United Nations. The core commitment of the SDGs is to "leave no one behind". Prosperity will be shared in everyone's home. But in reality, many people in the country are still lagging behind. Several of those who call themselves Dalit, in many areas are also known by the identity of 'Harijan'. Some have even contemptuously called them 'sweepers'.

There are 17 such colonies of non-Bengali-Dalit cleaners in this hundred-year-old Dhaka city. Besides, there are many localities of Rabidas and Rishis. Their life styles are similar to Dalits, though their professions are different. Rabidas and Rishis are about five to six thousand in number. They are involved in shoe making, sewing and leather work. Being educated is helping them to get involved with other professions, but it is hard to break the cycle of poverty.

The number of Kanpuris and Telugus among Dalit cleaners in Dhaka alone is around 50,000. There are some colonies where hundreds of families of them are living. There are also many small tenements/ghettos where 5-10 families are living. There are people like this at outside of Dhaka. All together, the number of such citizens is about half a million.

A lack of self-land, self-esteem and a sense of detachment from the old world of work are the major family characteristics of cleaning/ sanitation workers at the moment.

Although these people have been living in the capital for quite a few generations, they have not developed any land-based attachment with Dhaka. Dhaka is the main city of the country and has survived with the help of these people. This city has given its address to millions of people from different districts, but the Dalits' insecure overcrowded colony-life drags on, as is evident from their living-evacuation-rehabilitation in government owned land. Many colonies have been evacuated several times.The residents of Dhaka's Ganaktuli Colony were once in the Eden area of Palashi. The current Dalit residents of Gabtali were earlier in Mohammadpur. Dhalpur's Telugus are settled in this present place in 1990 by evacuated from Wari and Sayedabad. However, they did not get any ownership of the land.

The Rabidas now live on government allotted land. In that year 1943, a total of 28 Rabidas families were given a residence on a 99-year lease in Wari of Dhaka. Today, after 77 years, the number of families in the same colony stands at 320. But the space did not increase.

According to the present author's own research, 60% of Dalits feel that they do not own the land where they live. 55% of them

said that they are always in fear of eviction. Even where there is no fear of eviction, many generations of the same family have to live in houses like old shacks.

Besides this, there is unemployment. No matter how highly educated, Dalit children are still not used to thinking about any other vocation than cleaning. And the families also want the garbage cleaning work of the city corporation because that means they are entitled to government living quarters. They must have a government employment certificate otherwise it becomes difficult for them to stay in their current residence. But there are allegations that they have to pay bribes to get such jobs.

It is not easy for these people to 'buy a job' at a high price. As a result, the old Dalit sweeper society no longer has the monopoly of cleaning garbage in any city of Bangladesh. Among the 8,000 to 10,000 workers involved in this work in Dhaka, their number has already dropped 1,200 to 1,300. This is their complaint. But Dalit cleaner want more share in their ancestral profession. In Dhaka's Dhalpur Colony, it was seen that 72 of the 205 families have jobs in the City Corporation. The rest of them work as cleaners in various private institutions.

It was also seen on the ground that the government is constructing buildings for cleaners in different parts of Dhaka. Two buildings have come up in Dhalpur where 120 families can live. Wari has three buildings to accommodate 240 families. Many multi-storied houses are being constructed in Ganakatuli and Gabtali. Two buildings are also under construction in Nazirabazar. These buildings will solve the housing problem of cleaners in Dhaka to some extent. But the problem remains that the buildings are less than the people. For example, the new

houses in Dhalpur are able to accommodate 120 families while there are 205 families are living. A maximum of 100 families will get space in two buildings against 700 houses in Nazirabazar. The rest have to stay in the rooms of the previous cramped spaces. It is not clear to anyone in the colony who will be accommodated in the new building and who will not. There is also a fear that families who do not have jobs in the city corporation will not get houses.

A positive aspect among Dalit families is the expansion of education in the last two decades. The father may be making shoes somewhere under the sun and rain, but there is the likelihood of him sending his child to school. Unfortunately, environment in the colony is hardly conducive to study. The president of Dhalpur Telugu School – A Joseph Das - mentioned the lack of quality education. Harijan organizer Gagan Lal has the same regret in Nazirabazar. Since 2013, the number of Dalit quota students in various universities is increasing everywhere.That quota is still struggling to get legal status and still not more than 1-2 percent of Dalit students in the primary stage is being graduated. Lack of quality education is a major factor in this case.

In 2022, as in other years, policymakers

say poverty is falling in Bangladesh and life expectancy is increasing. But it is not happening in Dalit working class families at the same rate as it is happening in mainstream society. To reduce this imbalance in the national development stream, specific social security programs are needed for them. Some of such programs were in the budget a year or two ago. The governments have ambition to include all the poor in some form of social safety net program by 2025. Different sections of the Dalit community need to be given priority consideration in this regard.

Many social safety net programs which started earlier for Dalits have been converted for the 'backward classe's and given a large share to the non-Dalits. They can again be specified for Dalits. Besides, it is necessary to immediately approve the draft anti-discrimination bill as a law in the parliament. In 2022, this law was the main activity of all Dalit organizations. In 2014, the Law Commission prepared the first draft of the Elimination of Discrimination Act. Subsequently, the National Human Rights Commission refined the draft law in 2018 in consultation and review with various civil society organizations. A uniform draft has been formulated by identifying and redressing the problems of all marginalized groups, thereby making it possible for all discriminated citizens, especially Dalits, to obtain redressal of social marginalization through this act.

712 workers died in workplace accidents during the year 2022

712 workers (including 50 killed in Sitakunda accident) were killed in 547 workplace accidents across the country in the last year, from January-December of 2022. The survey was conducted by Safety and Rights Society (SRS) based on news published in newspapers (15 national and 11 local). Workers who died outside the workplace or on the way to and from the workplace in road accidents or due to other causes were not included in this survey.

Analyzing the data of workplace accidents obtained from the survey, it was found that the highest number of workers were killed in the transport sector with a total of 333 people, followed by 170 people in service sector (such as workshops, gas, electricity supply companies etc.). 104 workers were killed in the construction sector, 62 in agriculture sector and 43 people in factories and other manufacturing industries.

By reviewing the causes of death, it is found that 353 workers were killed in road accidents; 84 in different explosion; 69 electrocuted; 57 lightning stroked. In addition, 45 workers died after falling from the scaffolds or above; 38 were hit or crushed by a hard or heavy object; 24 died from drowning in water; 14 were burned by fire; 14 were exposed to chemicals or toxic gases in septic tanks or water tanks. Hill or quarry, bridge, building or roof, wall collapsed caused the death of 13 workers and cause of 1 worker's death was not specified.

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি

৬/৫ এ, স্যার সৈয়দ রোড (২য় তলা)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০

info@safetyandrights.org
safetyandrights.org
Safety and Rights Society
Safety and Rights Society